বাবুইবাসা বোর্ডিং

দ্বিতীয় খণ্ড

(কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাস)

স্বপনবুড়ো

বাবুইবাসা বোর্ডিং

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

এর মধ্যে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে !

অনেক পুরোনো বোর্ডার চলে গেছে, আর বহু নতুন বোর্ডার এসে বাবুইবাসায় আস্তানা করেছে।

রতন সবাইকে চেনে না। নতুন করে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে।

কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে! রতনেরও হয়েছে তাই।

ইতিমধ্যেই নতুন নতুন হাসিমুখের দল তার চার পাশে এসে ভিড় জমিয়েছে !

পুরোনো ছাত্র যারা আছে, তাদের কাছে নতুনের দল খবর পেয়েছে—রতনের মধ্যে কী কী গুণ লুকিয়ে আছে !

তাই সবাই মিলে রতনকে ডাকাডাকির অন্ত নেই।

কেউ বলে রতনদা, 'আমি কিন্তু একেবারে সাঁতার জানি নে। আমাকে তাড়াতাড়ি সাঁতার শিখিয়ে দিতে হবে।'

কেউ এগিয়ে এসে আবদার জানায়, 'আমায় কিন্তু যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে হবে।'

আবার কেউ কেউ আসে গোপনে—রাত্রে। তারা ফিসফিস করে বলে, 'রতনদা, আমায় কিন্তু সেই জিনিসটি শিখিয়ে দিতে হবে !'

রতন শুনে মিটিমিটি হাসে ; বলে, 'সেই জিনিস কি রে ?'

ছেলেটি একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে উত্তর দেয়, 'ওই যে জঙ্গলে গিয়ে যার লক্ষ্য ঠিক করতে হয়।'

রতন তখন হো-হো করে হেসে ওঠে, বলে, 'হবে রে হবে। আমি যখন আবার বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ফিরে এসেছি, তখন তোদের সব কিছু শিখিয়ে দেবো !

এইভাবে আবার ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিরাট এক দল !

তাদের নিয়ে রতন নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সাঁতারের মতো ভাল ব্যায়াম আর কিছুতে হয় না। দুই হাতের দাঁড়-টানার সঙ্গে, পায়ের জল কাটার সঙ্গে, বুকের সঙ্গে, জলের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে গোটা দেহটা সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

রতন তাই বলে দিলে সবাইকে—সকলের আগে সাঁতার শিখতে হবে। সাঁতার শিখলে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব মনের মধ্যে গড়ে ওঠে।

সাঁতারের দৌড়ে কে কাকে আগে ছাড়িয়ে যাবে তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলে।

আমি সকলের আগে এগিয়ে যাবো—এই হয় তখন সবাইকার পণ। তরতর করে হাঁসের মতো এগিয়ে চলে ছেলের দল। তখন রতন দেখে আর হাততালি দিয়ে হো-হো করে হাসে।

আস্তে আস্তে রতন ছেলেদের সব কিছুতে সব রকম শিক্ষাই দিতে লাগলো।

নদীর বুকে চললো সাঁতার দেওয়া। তা ছাড়া খালি হাতে ব্যায়াম, রিং করা, কুস্তি লড়া, যুযুৎসু শেখা, দড়ি লাফানো—সব কিছুতে নিজেদের পারদর্শী করে তুলতে হবে।

তারপর এদের থেকে বাছাই করে সকলের অগোচরে গভীর জঙ্গলে গিয়ে মাত্র কয়েকজনকে 'আগ্নেয় অস্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া হয়। বাইরের কাক-পক্ষীও তার বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারে না।

সাঁতার যে শুধু বোর্ডিং-এর ছেলেরাই শেখে তা নয়,—আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক ছেলে এসে রতনের কাছে সাঁতার দেবার কৌশল শিখে যায়। এইভাবে বিরাট এক সাঁতারু দল গড়ে উঠলো!

তখন রতন মনে মনে স্থির করলে, এদের নিয়ে একটি 'সন্তরণ-প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করতে হবে। কেননা সে চলে যাবার পর থেকে এই অঞ্চলে আর সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয় নি! ছাত্রদের মনে যাতে উৎসাহের সঞ্চার হয় তার জন্য মাঝে মাঝে এই জাতীয় সাঁতারের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে।

সেদিন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে রতন ছেলেদের সঙ্গে এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার কথা আলোচনা করছিল। কোথা থেকে সাঁতার শুরু হবে—আর কোন্ পর্যন্ত ছেলেরা সাঁতরে চলে যাবে—সেইটে ঠিক যখন হয়ে গেল তখন রতন অন্যান্য বিষয় ঠিক করবার জন্য নদীর ধারে বসে নতুন করে কথাবার্ত্তা শুরু করে দিলে।

সাঁতারের সময় একদল রক্ষী নৌকো নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সেই নৌকোতে একজন ডাক্তার এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া নদীর ধারে মেলা বসবে, নাচের গানের ব্যবস্থা থাকবে ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্য।

আলোচনায় সবাই যখন মেতে উঠলো, তখন হঠাৎ একটি ছোট ছেলে ছুটে এসে রতনের হাতে একটি খাম গুঁজে দিয়ে আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

রতন খামের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝতে পারলে, চিঠিখানি পাঠিয়েছেন জীবনদা। ওপরে সেই রকম একটি চিহ্ন ছিল—যাতে রতনের বোঝার কোনো অসুবিধে না হয়।

সবাইকে বিদায় দিয়ে রতন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ফিরে এলো। চিঠিখানা নিরিবিলিতে পড়তে হবে।

জীবনদা লিখেছেন—আজ রাত দুটোর সময় বাবুইবাসা বোর্ডি-এর সামনেকার ঘাটে একটা নৌকো থাকবে। মাঝির সঙ্গে সোজা চলে আসতে হবে। মাঝিই নির্দেশ দেবে—রতনের জন্য কি কাজ ঠিক হয়ে আছে!

চিঠিখানা পড়েই রতন নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললে। এখন তা হলে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা সিকেয় তোলা থাক। এবার—

"—চলো মুসাফের—
বাঁধো গাঁঠোরিয়া—
বহুদূর যানে হোগা—"

এবার তার জীবন-দেবতা কোন্ দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—রতন তা কিছুই বুঝতে পারলে না।

গভীর রাত।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছাত্রদল নিজ নিজ ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

রতন এক কাপড়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দূরে কোথায় যেন ঢং-ঢং শব্দ হল—দুটো বাজল।

নদীর ধারে একটি ছোট্ট ডিঙি নৌকো ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সাঙ্কেতিক কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে—তার জবাব পাওয়া গেল মাঝির মুখ থেকে।

তখন রতনের আর কোনো সন্দেহ রইলো না। সে নিশ্চিন্তমনে নৌকোয় উঠে সটান শুয়ে পড়লো। রাত দুটো পর্যন্ত তাকে মশা তাড়িয়ে জেগে থাকতে হয়েছে। ঘুমে তার দুটি চোখ বুজে আসছে। একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে সে আবার অসুরের মতো পরিশ্রম করতে পারবে।

ডিঙি নৌকো কখন ছেড়েছে—ঘুমের আমেজে রতন তা জানতেই পারে নি!

ঘণ্টা দুয়েক বাদে মাঝি ওকে ডেকে তুললে; বললে, 'এইবার তুমি তোমার কাজ বুঝে নাও।'

চোখ কচলে উঠে বসে রতন বললে, 'বলো, শুনে নেই।'

মাঝি বললে, 'এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বিপ্লবীদের একটি তালিকা তৈরী করেছে। তাদের কালাপানি-পারে পাঠিয়ে দেবার মতলব। তার বাড়িতে ছোকরা

চাকর হয়ে কাজে লাগতে হবে। তালিকা দেখে সুবিধে মতো বিপ্লবীদের নামগুলো টুকে নিতে হবে। খবরদার তালিকাটি যেন সরিয়ে এনো না। তা'হলে ব্যাটার সন্দেহ হবে। সেই নামগুলো পেয়ে গেলে বিপ্লবীদের আগে থেকেই লুকিয়ে ফেলা হবে। তখন পুলিশ ব্যাটারা খুঁজে মরুক!

—বেশ মজার কাজ ত!

রতন আপন মনেই বললে! তারপর একটু মুচকি হেসে প্রকাশ্যে বললে, 'অনেক দিন একটা মনের মতো কাজ না পেয়ে গিঁটে গিঁটে যেন বাত ধরে গেছে! এইবার মনের সাধে হাত-পা নাড়া-চাড়া করা যাবে।'

মাঝিও মুচকি হেসে উত্তর দিলে, 'হুঁ। এই জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের বাড়িতে অনেক খাটুনি। দু'মিনিট সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। এর আগে আরো দু'জন লোককে আমরা বহাল করেছিলাম, কিন্তু তারা টিকতে পারে নি—বাপ-বাপ করে পালিয়ে এসেছে।'

শুনে ভারী কৌতুকবোধ হল রতনের। উত্তর দিলে, 'ভারী মজার ব্যাপার ত'! নতুন অভিজ্ঞতার দাম আছে বৈ কি! না হয় কয়েক দিন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের অন্ন ধ্বংস করা যাক।'

অবশেষে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের নৌকো এক শহরের কিনারে এসে উপস্থিত হল।

রতন ইতিমধ্যে এক ছোকরা চাকরের সাজ নিয়ে কোমরে একটা ছেঁড়া গামছা বেঁধে ফেলেছে। নৌকোর মাঝিই তাকে যথাসময়ে সেই সাজ সরবরাহ করেছে। ওদের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই।

পথ চলতে চলতে রতন জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা ভাই নৌকোর মাঝি, এবার আমার নাম কি হবে শুনি?'

মাঝি মুচকি হেসে উত্তর দিলে, ভোম্বল!

—'অ্যাঁ! ভোম্বল!'

রতন যেন আঁতকে উঠলো।

একটি ভাড়াটে বাড়িতে পুলিশ অফিসারটি থাকেন। অফিসারটি হয়ত টিকটিকি বিভাগের লোক। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার কোনো উপায় নেই। গেটেও কোনো রকম কড়া পাহারা নেই।

ওরা দু'জনে সরাসরি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। একটি লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক বারান্দার টেবিলের পাশে একটি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিলেন। ওদের দেখতে পেয়ে কাগজ থেকে মুখ তুললেন; জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নাকি তোর ছোকরা চাকর?'

মাঝি ভক্তিভরে ওর পায়ের ধূলো নিয়ে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা, এমন বিশ্বাসী লোক আপনি ত্রিভুবনে আর দুটি পাবেন না।'

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, 'অ্যাঁ! বলিস্ কিরে ? ত্রিভুবনে মাত্র একটি ! আর কোথাও এর জুড়িদার খুঁজে পাওয়া যাবে না ?'

মাঝি মুখ নীচু করে জবাব দিলে, 'সত্যি তাই কর্তা। দু'দিনেই আপনি এর পরিচয় পাবেন।'

লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক তখন রতনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁরে কি নাম তোর ?

দু'হাত কচলে মাথা নীচু করে বিনয়ের অবতারের মতো রতন উত্তর দিলে, আজ্ঞে আমার নাম ভোম্বল। তবে আমি একটু কানে খাটো। একটু জোরে হুকুম করবেন হুজুর !'

কর্তা মনের আনন্দে আরো জোরে জোরে দালান-কোঠা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর একটু থেমে কর্তা বললেন, 'বেশ ভাল কথা। কানে খাটো লোক বেশ কাজের হয়। টিকে থাকবি ত' অনেক কাল ?'

যেন কথাটা শুনতে পায় নি এই ভাবে ভোম্বল বললে, 'আজ্ঞে কর্তা, টিকে দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে আসবো ?'

কর্তা ওর কথা শুনে ভারী খুশী হলেন ; বললেন, 'আচ্ছা, আগে টিকে দিয়ে তামাকই ধরিয়ে নিয়ে আয়। ত্রিভুবনে মাত্র একটি কাজের মানুষ ! তার গুণের পরীক্ষাটা হয়েই যাক।'

মাঝি আর একবার কর্তার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, 'আচ্ছা কর্তা, আমি এখন তা'হলে যাই। পরে এসে না হয় খবর নিয়ে যাবো।'

কর্তাকে খুব খুশী বলেই মনে হল। তিনি উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। তোর কাজের মানুষের যাচাই হয়ে যাক্'—

মাঝি ওকে আর একবার মন দিয়ে কাজকর্ম করতে বলে, বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু মন্তব্য করলে, 'কাজ দিয়ে কর্তাকে খুশী কর্—মাইনের জন্যে ভাবতে হবে না। অন্য জায়গায় যা পেতিস তার ডবল টাকা মিলবে।'

—'ঠিক আছে—ঠিক আছে !'

আবার লম্বা-চওড়া মানুষটির অট্টহাস্য শোনা গেল। সেই ফাঁকে মাঝি পালিয়ে গেল।

কর্তা বললেন, 'দেখ, বাড়ির কথা বাইরে যেতে পারবে না। খুব হুঁশিয়ার। তুই যদি বোবা হতিস ভোম্বল, তা'হলে আমার কাজের আরো সুবিধে হতো।'

ভোম্বল মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে কর্তা, কথা বলি বটে, তবে সে কথা বাইরে পর্যন্ত পৌঁছুবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তা।'

কর্তা তখন হাঁক দিলেন, 'ওগো শুনছ, এই যে ছোকরা চাকর এসেছে। ওকে নিয়ে যাও—সব কাজ বুঝিয়ে দাও।'

কর্তার হাঁক শুনে এক অপরূপ সুন্দরী বৌ ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বৌটি কোনো কথা বললে না। শুধু ইঙ্গিতে তাকে সঙ্গে আসতে বলে আবার ঘরের ভেতর চলে গেল।

ভোম্বল মনে মনে ভাবলে, এমন জাঁদরেল জানোয়ারের এমন সুন্দরী বৌ! ওর পাশে একে একেবারেই মানায় না।

মনের ভাব গোপন করে ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, তোমায় আমি দিদি বলে ডাকবো—কেমন?'

দিদি ডাকের কথা শুনে বৌটি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। ধমক দিয়ে চাপা গলায় বললে, 'খবরদার, আমায় কাউকে দিদি বলে ডাকতে হবে না। দিদি?—না—না, আমার কোনো ভাই নেই। সে মরে গেছে—আর আসবে না।'

পর মুহূর্তেই ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলো বৌটি ছুটে গিয়ে একটা তক্তপোশের ওপর নিজের দেহ লুটিয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ভোম্বল এই কাণ্ড দেখে ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। না জেনে সে কি বৌটির মনে কষ্ট দিলে?

বৌটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে আঁচলে চোখ দুটি মুছে ফেললে। তারপর অনেকক্ষণ ভোম্বলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হাত ইশারা করে ওকে কাছে ডাকলো।

ফিস্‌ফিস্ করে বৌটি বললে, 'আমার একটি ভাই ছিল ঠিক তোরই মতো দেখতে। সে আর কখনো আমার পাশে এসে দিদি বলে ডাকবে না। তাই ত' আমি আর 'দিদি' ডাক সইতে পারি না। খবরদার, তুই আমায় কখনো দিদি বলে ডাকবি নে। পুলিশের লোক আমার সেই ভাইটিকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!'

ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলে, বৌটির দু'চোখ বেয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ছে!

এ বাড়ির বৌটা কি পাগল নাকি? সে নতুন এলো চাকর হয়ে। তার কাছে নাকি কেউ মনের কথা খুলে বলে!

ভোম্বল আপন মনে এই কথা ভাবতে থাকে। বৌটি হঠাৎ বলে বসে, 'বুঝলি, আমি ঠিক করেছি এর প্রতিশোধ নেবো; তাই ত' এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছি। তুই আমাকে সাহায্য করবি ত'?'

ভোম্বল কোনো কথার জবাব দিতে পারে না। অবাক হয়ে বৌটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

॥ দুই ॥

বাড়ির কর্তা ডেকে বললেন, ওরে ভোম্বল, এদিকে আগে শুনে যা'—

ভোম্বল দুটো মুড়ি খাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি গামছায় বেঁধে রেখে এসে শুধোলো, আজ্ঞে কর্তা, কি হুকুম করছেন—বলুন।'

কর্তা মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কি করছিলি তাই আগে বল।'

ভোম্বল জবাব দিলে—আজ্ঞে, দিদিমণি দুটো মুড়ি খেতে দিয়েছিলেন, এতক্ষণ ধরে তাই চিবুচ্ছিলাম।

শুনে কর্তার হাসি দেখে কে!

সামনে-পেছনে দুলে দুলে তিনি হাসতে লাগলেন। আর হাসতে সুরু করলেই কর্তার চোখ দুটি আপনা থেকেই ছোট হয়ে আসে।

অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে কর্তা বললেন, 'অ্যাঁ! তুই তো খুব তুখোড় ছোঁড়া দেখতে পাচ্ছি! একেবারে দিদিমণি জুটিয়ে বসে আছিস? কিন্তু খুব সাবধান। দিদিমণি ডাক শুনলেই ও একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। মারধোর খাওয়ার সাধ হয়েছে বুঝি? খবরদার, ও নামে ডাকিস নে—তা'হলে সত্যি বিপদে পড়বি।'

কর্তার আবার দুলে-দুলে সেই মজাদার হাসি।

হাসি থামলে তবে ত' কথা!

কর্তা গলা খাটো করে বললেন, 'আরে বোকা ছেলে, তুই মিছিমিছি তোর দিদিমণির কাছ থেকে মুড়ি চিবিয়ে মরছিস কেন? আমার সঙ্গে চল বাজারে। দেখবি, আমি তোকে জিলিপি আর রসগোল্লা খাওয়াবো। তারপর বাজার-টাজার করে ভালো মাছ নিয়ে ফিরে আসা যাবে। কথায় বলে, মাছ-ভাতে বাঙালী। ভালো টাট্‌কা মাছ না হলে খাওয়া হয়? চল আমার সঙ্গে'—

একটা বাজারের থলে নিয়ে ভোম্বল কর্তার সঙ্গে বাজারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

যাবার আগে কর্তা হাঁক দিয়ে বলেন, 'শুনছ, আমি মাছ আনতে চললাম। আগে থাকতেই শাক আর ডাল রান্না করেই উনুনে জল ঢেলে দিয়ে বসে থেকো না। তোমার আবার যে তড়িঘড়ির ব্যাপার!'

সঙ্গে সঙ্গে কর্তার কাক-চিল-ওড়া হাসি শোনা গেল। না হেসে কর্তা কথা বলতে পারেন না। দেখে মনে হয় একেবারে দিলদরিয়া মানুষ।

পথে আর কোনো কথা হল না।

কর্তা কি যেন ভাবতে ভাবতে পথ চলেছেন।

বাজারে পৌঁছে আবার সেই দিলদরিয়া ভাব ফিরে এল।

—ওরে ভোম্বল, কি খাবি বল। মিছিমিছি বেনো বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি বল ? দিদিমণিই ডাকিস, আর পায়ে তেল মালিশ করেই দিস—শুধু জুটবে ওই শুকনো মুড়ি। তার চাইতে আমার কথা মেনে চল—মিলবে এই রকমারি খাবার ! নে, যত পারিস চালা—

সত্যি, ওকে এক ঠোঙা খাবার কিনে দিলেন কর্তা।

রতনের খিদেও পেয়েছিল খুব।

কোনো রকম উচ্চ-বাচ্য না করে সে একমনে খাবারগুলো মুখে পুরতে লাগলো। যখন খাবার শেষ হয়ে গেল, ঢকঢক করে দুই গেলাস জল খেয়ে ফেললে সে।

কর্তা শুধোলেন, 'কিরে, আরো চাই ?'

ভোম্বল পেটে হাত বুলিয়ে জবাব দিলে, না কর্তা। পেট একেবারে জয়ঢাক। তার ওপর দুই গেলাস জল। ভরা নদীতে নৌকো চলছে যেন।

কর্তা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্তা আবার বললেন, 'বাজার পরে হবে। চল, আগে এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

বন-জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। সহজে বোঝবার উপায় নেই যে ওটা রাস্তা—কর্তা সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন।

আরো কিছু দূর এই ভাবে চলবার পর—দূরে দেখা গেল একটা পুরোনো আমলের দোতলা বাড়ি।

এখানে আবার কে থাকে ?

কর্তার মতলবখানাই বা কি ?

রতন এইবার সত্যি ভাবনায় পড়ে।

ততক্ষণে ওরা একেবারে সেই ভাঙা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কর্তা বললেন, 'আমার সঙ্গে আয়—

কর্তার দেখানো অন্ধকার পথে ভোম্বল ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়ে।

ভেতরে গিয়ে দেখে একটা ঘরে অনেকগুলো জোয়ান লোক বসে কাগজপত্র নিয়ে কী সব কথাবার্তা বলছে। কর্তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

কর্তা বললেন, 'লগন সিং, এইদিকে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে একটি জোয়ান ছেলে এগিয়ে এলো।

কর্তা আবার বললেন, 'লগন সিং, এই ছেলেটিকে চিনে রাখো। একে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।'

এইবার কর্তা নতুন করে যেন ভোম্বলের দিকে তাকালেন। বললেন, 'শোন ভোম্বল, তোর আসল জরুরী কাজের কথাটা শুনে রাখ। লগন সিং আজ বাজারের মধ্যে তোকে একটি লোককে চিনিয়ে দেবে। তোকে তার সব খবর ধীরে ধীরে নিতে হবে। দরকার হয় তার সঙ্গে আলাপ করবি, ভাব করবি, তার বাড়ি যাবি। লোকটা কোথায় যায়, কি করে—সব খবর আমার জানা দরকার।'

রতন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, কর্তার মুখের সেই দিলখোলা হাসি একেবারে মিলিয়ে গেছে। ছুটি চোখের মাঝখানে কী একটা মতলব যেন বাসা বেঁধেছে। ভুরু ছুটি কাঁপছে। আর ঠোঁটের মধ্যে লুকোনো রয়েছে—কী একটা চাপা শয়তানি।

তা'হলে এতক্ষণ ধরে কর্তা যে হাসছিলেন—সেটা কি তাঁর আসল রূপ নয়? আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়েছে এই ভাঙাচোরা ঘরের মাঝখানে,—এই আলো-আঁধারি আশঙ্কাজনক আবহাওয়ায়?'

মনে মনে হাসলে রতন।

তাকে পাঠানো হয়েছে একটা লোকের ওপর খবরদারী করতে, আর সেই লোকটা কিনা উল্টো অপর মানুষের পেছনে তাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করছে!

তা'হলে দেখা যাচ্ছে—খেলাটা জমবে ভালো।

লগন সিং-এর দিকে ভোম্বল আর একবার তাকালো। বাঙালীরই ছেলে, দিব্যি ব্যায়াম-করা দেহ। ওর নাম তা'হলে লগন সিং হল কেন?

এরাও কি সব ছদ্মবেশে কাজ হাসিল করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে?

অনেক কিছু আপন মনে ভাবতে লাগলো রতন।

কর্তা তখন ঘরের একটা কোণে গিয়ে ফিস্-ফিস্ করে লগন সিংকে কি সব বোঝাচ্ছেন।

কর্তার কথা শুনে লগন সিং শুধু তার মাথা নাড়ছে আর 'হাঁ-জি, হাঁ-জি করছে।

আরো খানিকক্ষণ বাদে কর্তা ভোম্বলের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এইবার থেকে লগন সিং-এর সঙ্গে বেরুতে হবে। তারপর কি কি করতে হবে—লগন সিং সব বুঝিয়ে দেবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। ঠিক-ঠিক মতো কাজ হাসিল করতে পারলে মাইনে ছাড়াও বকশিশ মিলবে। বুঝলি বোকচন্দর?'

না বুঝে আর উপায় কি? রতন মনে মনে বুঝে নিয়েছিল—পড়েছি মোগলের হাতে, যেতে হবে তার সাথে। এখানে ওজর-আপত্তি তোলা মানেই বিপদে পড়া। তার চাইতে বুদ্ধিমান ছেলের মতো মুখ বুজে কথা শুনে যাওয়াই ভালো।

তবু একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে—বাজারে মাছ কিনতে হবে না কর্তা?

কর্তা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—সেজন্য তোর কোনো ভাবনা নেই। আমি সময়মতো মাছ নিয়ে যাবো। কিন্তু তোর কাজ হাসিল করা চাই।

লগন সিং-এর সঙ্গে ভোম্বল পথ চলতে সুরু করে দিল।

এবার কিন্তু নতুন আঁকা-বাঁকা পথ। অনেকক্ষণ বাদে ওরা একটি নদীর ধারে গিয়ে হাজির হল। খুব বড় নদী নয়—ছোটখাট নদী।

সেই নদীর ধারে একটি ছোট খড়ের বাড়ি।

লগন সিং পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'ওহে ভোম্বল, এইবার আমাদের এই বাড়ির একেবারে পেছন দিকে যেতে হবে।

ভোম্বল তার কথার কোন প্রতিবাদ করলে না! সে ভালো রকমই জানে, এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তার চাইতে বাধ্য ছেলের মতো হুঁ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঝোপ-জঙ্গল আর বেত-কাঁটা সরিয়ে ওরা দু'জনে যেখানে গিয়ে উপস্থিত হল—সেটা ওই খড়ো বাড়ির একেবারে পেছন দিকটা।

সেখান থেকে বাড়ির উঠোনটা দিব্যি দেখা যায়। লোকজন আসছে যাচ্ছে, বাড়ির গিন্নী কাজের ফাঁকে এঘরে-ওঘরে আনাগোনা করছে—ওই ঝোপের আড়াল থেবে সব কিছু চোখে পড়ে।

একটু বাদে আঠারো-কুড়ি বছরের একটি সুন্দর ছেলে উঠোনে নেমে এলো। ছেলেটির ভালো স্বাস্থ্য, লম্বা চেহারা! রীতিমতো ব্যায়ামচর্চা না করলে এমন সুন্দর স্বাস্থ্য হতে পারে না।

লগন সিং বললে, 'এই ছেলেটিকে ভালো করে চিনে রাখো ভোম্বল। একে নিয়েই এখন তোমার সব কাজ।

ওরা দু'জনে অবাক হয়ে দেখলে—একটি ফুটফুটে মেয়ে ওর পেছন পেছন উঠোনে নেমে এসে বললে, 'দাদা, তুমি এরই মধ্যেবাজারে চললে, কিন্তু আমার অঙ্ক যে এখনো শেষ হয় নি।'

ছেলেটি উত্তর দিলে—কত অঙ্ক আর করবি বল? এখন বাজারে না গেলে সব মাছ ফুরিয়ে যাবে। জানিস ত'—মাছ না হলে মা একেবারে ভাত খেতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি বাজার করে ফিরে আসছি।

কিন্তু মেয়েটি একেবারে না-ছোড়-বান্দা; বললে, 'হু! তা বৈ কি! বাজারে গেলে তোমার রাজ্যের লোকের সঙ্গে দেখা হবে, আর তাদের সঙ্গে তোমার হাজার কাজ। কাল অঙ্ক না নিয়ে যাবার জন্য আমি বকুনি খেয়েছি। আজও যদি সেই ব্যাপার ঘটে তা'হলে আমি ইস্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দেবো।

ছেলেটি বোনের চুলটা টেনে নিয়ে উত্তর দিলে—পাগলি মেয়ে ! আমি বাজারে যাবো আর আসবো। তখন দেখবো, তুই কত অঙ্ক করতে পারিস।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি থলে হাতে বেরিয়ে গেল।

লগন সিং ফিস্-ফিস্ করে ভোম্বলকে বললে, 'এইবার তোমার কাজ সুরু হবে। প্রস্তুত হও'—

ভোম্বল জবাব দিলে, 'প্রস্তুত ত' হতে বলছ ; কিন্তু কিসের জন্য প্রস্তুত হবো—সে-কথা না বললে কি করে বুঝবো ?

লগন সিং ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে সুরু করলো। বললে, 'চলো, যেতে যেতে তোমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।'

শোনো ভোম্বল ভাই, ওই যে ছেলেটিকে এতক্ষণ দেখলে, উঠোনে দাঁড়িয়ে বোনের সঙ্গে খুনসুটি করছিল—ও এখন নদীর ধার দিয়ে বাজারের দিকে যাবে। এখন তোমার একটা জরুরী কাজ আছে।

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'কি কাজ ? ওর হাতে কোনো চিঠি দিয়ে আসতে হবে ?'

ওর কথা শুনে লগন সিং হেসে উঠল ; বললে, 'না না, অত সোজা কাজ নয়। তোমায় খানিকটা কসরৎ দেখাতে হবে।'

—কসরৎ ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কসরৎ। তুমি যেন এই নদীর মধ্যে আচমকা পড়ে গেছ। সাঁতার জানো না ; বেশ খানিকটা জল খেয়েছ। বাঁচবার জন্য আঁকুপাকু করছ। দু'হাত তুলে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছ—কে কোথায় আছ—আমায় বাঁচাও !

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে—সে কি ? তার মানেটা কি ? আমি যে খুব ভালো সাঁতার জানি !

লগন সিং উত্তর দিলে, 'সে ত' আরো ভালো। প্রাণের ভয় থাকল না। খুব আমেজ করে অ্যাক্টিং করতে পারবে। জানো ত, ওই জাতীয় ছেলেরা লোকের উপকার করবার জন্য তৈরী হয়েই থাকে ; তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় নদী থেকে তুলে নিয়ে আসবে।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'তাতে লাভটা কি হবে ?'

লগন সিং জবাব দিলে, 'লাভ যা হবে সেটা পরে জানতে পারবে। এখন ত' কাজে লেগে যাও। আমাদের কর্তার যে হুকুম সেই কাজ। এতটুকু নড়চড় হবার যো নেই। আজ তুমি চাকরি পেয়েছ, আর আজকেই তোমায় পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় ফেল হলে যে পিটুনী জুটবে—তা শিকেয় তোলা আছে। ছেলেটা এতক্ষণ সামনের দিক দিয়ে নদীর ধারে পৌঁছে গেছে। যাও—এইবার ছুট লাগাও !'

ভোম্বল তখন আর কি করে ! পুলিশের দলের পাল্লায় পড়েছে সে।

একেই বলে, বাঘে ছুলে আঠারো ঘা। পুলিশে যখন বুড়ী ছুঁয়ে দিয়েছে, তখন গায়ে-গতরে ঘা হবে বৈ কি !

ভোম্বলও আর কিছু না ভেবে-চিন্তে ছুট্ লাগালো নদীর ধারের দিকে। তারপর যেন হঠাৎ পা হড়কে জলে পড়ে গেছে—এই ভাবে নদীর মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবু-ডুবু খেতে সুরু করে দিলে।

—বাঁচাও—বাঁচাও—কে কোথায় আছ আমায় বাঁচাও !

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে অনেক লোক জমে গেল !

বাজারের সময়। কেউ বাজার করতে যাচ্ছে, আবার কেউ বাজার নিয়ে ফিরে আসছে।

ভীড় বাড়তে বিন্দুমাত্র দেরী হল না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, কেউ জলে নামতে রাজী নয় ! সবাই পারে দাঁড়িয়ে অপরকে পরামর্শ দেয়। একটা প্রকাণ্ড দড়ি হলে যে সেইটে ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচানো চলে—এমন মন্তব্যও কেউ কেউ করতে লাগলেন।

এমন সময় কোথা থেকে ছুটে চলে এলো সেই ছেলেটি। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে হাতের থলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

রতন খুব ভালো সাঁতার জানে; কিন্তু এই ছেলেটি জল কাটিয়ে এসে এমন অবলীলাক্রমে তার চুল ধরে তীরের দিকে নিয়ে এলো যে, রতন বুঝতে পারলে—এই ছেলেটি সন্তরণের সব কলা-কৌশলই জানে।

চারদিকের চ্যাঁচামেচি শুনে সেই মেয়েটিও বাড়ি থেকে ছুটে এসেছে নদীর ধারে। সে হাঁক-ডাক করে বললে, 'দাদা আগে দেখ, ও জল খেয়েছে কিনা। পেট থেকে জল বার করে ফেলতে হবে।'

রতন ইচ্ছে করেই কোনো সাড়া দিল না, চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো। দেখাই যাক না, ভাই-বোন ওকে নিয়ে কী কাণ্ডটা না করে।

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে সেই তরুণ সাঁতারুর সাঙ্গোপাঙ্গ একদল জুটে গেছে। খবর পেয়ে ওরা নানা দিক থেকে ছুটে এসেছে ওদের দলপতিকে সাহায্য করতে।

একজন বললে, 'ওরে শুভ, যে ছেলেটিকে তুই জল থেকে টেনে তুললি—ও বেশ খানিকটা জল খেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

আর একজন ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মন্তব্য করলে—ঠিক তাই। দেখছিস না, কেমন যেন একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—চোখ দুটো অবধি টেনে খুলতে পারছে না!

তৃতীয় ছেলেটি ফোড়ন কাটলে—আজ ওর একটা ফাঁড়া কাটলো সে-কথা বলতেই হবে।

আর একটা মাথা এগিয়ে এসে বিজ্ঞের মতো ব্যবস্থা দিলে—ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গুড়-জল খাইয়ে দে; তা'হলেই শ্রীমান চাঙ্গা হয়ে উঠতে পথ পাবে না।

শুভই হচ্ছে আসল দলপতি—যে ছেলেটিকে জল থেকে টেনে তুলেছে—

শুভ নিজেও কম পরিশ্রান্ত হয় নি। বন্ধুদের এগিয়ে আসতে দেখে ওরও মনের জোর ফিরে এলো।

শুভ বললে, 'আগে ওকে একটু গরম দুধ খাইয়ে দেওয়া দরকার।'

শুভর বোন শুভা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের নানা রকম টিপ্পনী শুনছিল। এইবার এগিয়ে এসে হাত-মুখ নেড়ে বললে, 'তোমরা ত' আচ্ছা কাজের মানুষ দেখতে পাচ্ছি! আগে ওকে ধরাধরি করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো। তারপর কে গুড়-জল খাওয়াবে, কে গরম দুধ মুখে ঢেলে দেবে—সব কেরামতি দেখা যাবে'খন।

শুভ ছেলেটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এইবার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বললে, 'আচ্ছা, তোরা সবাই তাকিয়ে ভালো করে দেখ ত'! ওকে ত' এই অঞ্চলের কেউ বলে মনে হচ্ছে না।'

বন্ধুরা জবাব দিলে—হ্যাঁ, একেবারে অচেনা ছেলে। অন্তত আমাদের জানাশোনা কেউ নয়।

এ অঞ্চলের সব ছেলেকেই ওরা চেনে। তাই ওদের সবার মনে একটা খটকা জাগলো।

দলের সবাই ঝুঁকে পড়ে ছেলেটিকে ভালো করে দেখতে লাগলো।

শুভার কিন্তু এই সব ব্যাপার মোটেই ভালো লাগে নি। সে আবার সবাইকে

তাড়া দিয়ে বললে, 'আচ্ছা, তোমরা সবাই কী বল ত'! আগে ছেলেটিকে সুস্থ করে তোলো। তারপর ওর ঠিকুজী-কোষ্ঠী জেনে নিলেই হবে। পরিচয়ের পালা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

তখন সবাই মিলে ধরাধরি করে ছেলেটিকে শুভদের বাড়ির উঠোনে নিয়ে এলো।

ভোম্বল তখন চোখ বন্ধ করে আপন মনে শুধু অঙ্ক কষে চলেছে—এর পর ব্যাপারটা কি ঘটে!

শুভ ওকে একটা গাছের তলায় শুইয়ে দিলে। তখনো ওর সারা গা দিয়ে জল ঝরছে।

শুভর নিজের জামা-কাপড়ের অবস্থাও ত ঠিক একই রকম।

শুভা বললে, 'দাদা, এইবার আমি আগে এক কাপ গরম দুধ নিয়ে আসি! ওটা খাইয়ে দিলেই ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

শুভ কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওর পেট থেকে জল বের করার জন্য। কিন্তু ভোম্বল জল খেলে তবে ত' মুখ দিয়ে জল বেরুবে! শুভর শুধু ওর শরীরটা নিয়ে কসরৎ করাই সার হল!

ওর কাণ্ড দেখে ভোম্বল আপন মনে শুধু হাসছে, কিন্তু বাইরে ত' সেটা প্রকাশ করতে পারছে না! তা করলেই ত সব মাটি। এখনো ওকে খানিকক্ষণ জলে-ডোবা মানুষ সেজে মজাদার অভিনয় করে চলতে হবে।

অবশ-অসাড় দেহটা পড়ে আছে ভোম্বলের, তাই সবাইকার হা-হুতাশেরও অন্ত নেই।

বাজার ফেরৎ যারা আসছিল, তারা এই মুখরোচক খবর পেয়ে আবার নতুন করে ওইখানে এসে ভীড় জমালো।

—আহা! কার বাছা গো! একেবারে নেতিয়ে পড়েছে!

—ভালো করে দেখ ত—নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে কি না!

—ভিজে একেবারে জব-জব করছে! তোমরা কেউ একটা শুকনো ধুতি পরিয়ে দাও না ছেলেটিকে।

এই জাতীয় নানা রকম উপদেশ চারদিক থেকে বুলেটের মতো ছুটে আসছিল। কাজের বেলা কেউ এগিয়ে আসে না, শুধু উপদেশ দিতেই ওস্তাদ!

ইতিমধ্যে শুভা এক কাপ গরম দুধ এনে ভোম্বলকে খাইয়ে দিলে।

উপস্থিত জনতা আশ্বস্ত হয়ে বললে—যাক দুধটা খেয়েছে। তা'হলে ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এসেছে!

বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শুভ ওর জামা-কাপড় খুলে নিয়ে নিজের শুকনো কাপড় আর একটা গেঞ্জি পরিয়ে দিলে। সে নিজেও ধুতি-জামা বদলে এসেছে।

দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে ভোম্বলকে সেইখানে শুইয়ে দিলে।

ভোম্বল ভাবলে, এখন একবার চোখ পিট-পিট করে আশে-পাশের দৃশ্যটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। দিব্যি কসরৎ করে চোখ চাইতে হবে—যেন কেউ না ধরে ফেলে।

একটুখানি চোখ পিট-পিট করতেই সামনের ঝোপের আড়ালে লগন সিং-এর মুখখানা নজরে পড়লো।

তা'হলে লগন সিং এখনো এখান থেকে নড়ে নি! নাটকের শেষ দৃশ্য অবধি না দেখে ও বুঝি এখান থেকে যেতে পারবে না! কর্তাকে গিয়ে আবার সব খবর জানাতে হবে ত'।

লগন সিং যত চালাকই হোক, অভিনয়ের ব্যাপারে কিছুতেই ভোম্বলকে হারিয়ে দিতে পারবে না—এ বিশ্বাস তার মনে মনে আছে!

কাজেই সে এই বেলাটা এই বাড়িতে থাকবার কায়েম ব্যবস্থা করবার জন্য 'উঃ আঃ' শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে আবার চোখ বন্ধ করলো।

বাড়ির কর্তা—শুভ ও শুভার বাবা বললেন, 'এখন ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। ওর এখন বিশ্রামের দরকার।'

শুভর বন্ধুরা তখন আবার ধরাধরি করে ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা বিছানাতে ভালো করে শুইয়ে দিলে।

শুভা বললে, 'ওর আরো একটু গরম দুধ খাওয়া দরকার। নইলে শরীরে জোর পাবে কেন?'

বাড়ির কর্তা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। তোমরা এখন ভীড় বাড়িও না। যে যার বাড়িতে চলে যাও। ছেলেটা বড় চোট পেয়েছে। ওর এখন ঘুমানো দরকার। সারাদিন ঘুমুলেই ছেলেটা একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

ভোম্বল ভাবলে, সব ব্যবস্থাই ত ভালো হলো, শুধু একটা অসুবিধের কথা যে, সারাটা দিন আর ভাত খাবার উপায় রইলো না। শুধু দু'কাপ দুধ খেয়ে কি পেটের ক্ষিদে কমবে? তা ছাড়া জলে ঝাঁপাঝাঁপিতে মেহনতটাও ত' নেহাৎ কম হয় নি।

কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই। কাজেই সে চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলো।

বাড়ির কর্তার নির্দ্দেশমতো শুভা ঘরের জানালা-দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে গেছে—যাতে রোগী নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

আর সত্যি ঘুমিয়েও পড়েছিল ভোম্বল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল, একটা

বিশাল নদীতে সে সাঁতার কাটছে। পেছনে একটা কুমীর দাঁত বের করে তাকে তাড়া করছে। সেই পুরোনো দিনের রতন প্রাণপণ শক্তিতে হাত-পা টানছে, কিন্তু কিছুতেই এগুতে পারছে না। এক্ষুণি বুঝি কুমীরটা তাকে কামড়ে ধরবে। ঠিক এমনি সময় হড়াৎ করে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। এক ঝলক রোদ্দুর এসে ওর চোখে-মুখে লাগলো, আর আচমকা স্বপ্নটা গেল ভেঙে।

ঝর্‌ঝর করে ঘাম ঝরছে সারা গা দিয়ে। বালিশ-বিছানা সব একেবারে ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে। হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে যেতে সে প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলো না—সে কোথায় আছে।

এ যে একেবারে অচেনা জায়গা !

ওর হাব-ভাব দেখে শুভা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে, 'এখনো মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে বুঝি ? বাড়ীর কর্তার আদেশ—এখন শুধু দুধ-সাবু।

এক মুহূর্ত্তে রতন ভোম্বল হয়ে গেল। মুখটা তেতোকুইনিন-খাওয়া মুখের মতো করে বললে, 'না—না—ও দুধ-সাবু আমি খাবো না'—

শুভার মুখে আবার সেই হাসি। বললে, 'তবে কি গরম-গরম ভাত আর মাছের ঝোল ? হুঁ ! সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। তবে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়ে খেতে হবে। সামনের উঠোনে গাছতলায় বসে বাড়ির কর্তা গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন !

ভোম্বল বললে, 'পেটের ক্ষিদেয় মারা গেলাম শুভাদি। তুমি আমায় বাঁচাও।'

শুভা মিষ্টি হেসে জবাব দিলে, সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। চুপি চুপি আমার সঙ্গে চলে আয়—এই পেছনের দরজা দিয়ে। টাট্‌কা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত—খেতে ভালোই লাগবে।'

ঠিক এমনি সময় উঠোন থেকে হাঁক শোনা গেল—ওরে, ছোঁড়াটা দুধ-সাবু খেয়েছে ?'

শুভা হাসি গোপন করে জবাব দিলে, 'খাচ্ছে বাবা !'

তারপর ভোম্বলকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সুরুৎ করে বেরিয়ে গেল।

ভোম্বল বড় বড় গ্রাস তুলে মুখে পুরছে।

শুভা বেশ বুঝতে পারছে—ওর কি রকম ক্ষিদেটা পেয়েছিল।

পাতের ভাত একবার ফুরিয়ে যেতে ভোম্বল শুধু খাটো গলায় বললে, আর একটু জল—

শুভা উত্তর দিলে, 'থাক আর জল খেয়ে পেট ভর্তি করতে হবে না।'

এই বলে আরো কিছু ভাত আর খানিকটা মাছের ঝোল পাতে ঢেলে দিলে।

এই সময় গুটি-গুটি পায়ে শুভও এসে রান্নাঘরে হাজির হল।

ভোম্বল বেশ বুঝতে পারলে যে, ভাই-বোন যুক্তি করেই ওর ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

শুভ জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যারে তোর নামটা কি? তোকে ত' এ অঞ্চলে আগে দেখি নি!'

ভোম্বল ঢক্-ঢক্ করে আরো খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে উত্তর দিলে, নাম আমার ভোম্বল। আমি এ অঞ্চলে নতুন এসেছি। চাকরির খোঁজ করছি।

শুভ বোনের মুখের দিকে একবার বুঝি তাকালে, তারপর বললে, 'তুই আমাদের এখানেই না হয় থেকে যা ভোম্বল। পড়াশোনা করবি, আবার আমার কথামতো কাজও করবি'—

ভোম্বল শুধোলে, 'কি কাজ করতে হবে?'

শুভ উত্তর দিলে, 'সে আমি যখন যে কাজে তোকে লাগিয়ে দেবো সেই কাজই করবি।'

ভোম্বল এক মুহূর্ত কি ভেবে নিলে। ওর নতুন মনিব ত' বলেছে—এই ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে ওর সব খবর জেনে নিতে হবে। এ ভালোই হল। একেবারে যাকে বলে মেঘ না চাইতেই জল।

ইতিমধ্যে শুভ তার বোন শুভার সঙ্গে কি পরামর্শ সুরু করে দিয়েছে।

শুভ বললে, 'এ ভালোই হল। শয়তানটা ত' এই নতুন ছেলেটাকে চিনবে না। একেই লাগিয়ে দিতে হবে—ওই শয়তানটার বাসায়। তারপর ধীরে ধীরে সব খবর বের করে নিয়ে আসতে পারা যাবে।'

শুভা উত্তর দিলে, 'হুঁ! এ ভালোই হল দাদা! যোগাযোগটা ভারি সুন্দর হয়েছে সাপও মরবে, আর লাঠিও ভাঙবে না।'

ভোম্বল যেন কিছু বুঝতে পারে নি—এই ভাবে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় সাপ?'

ওর কাণ্ড দেখে ভাই-বোনে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'হুঁ! সাপের সন্ধান আস্তে আসতে মিলবে, আর সেজন্য আমাদের সব সময় হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

ভোম্বল যেন অথৈ জলে পড়েছে—ঠিক অমনি মুখের ভাব করে ভাই-বোনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

পরের দিন ভোম্বল যখন একেবারে সুস্থ হয়ে গেল তখন শুভ ওকে নিয়ে সন্ধ্যার আঁধারে গিয়ে একেবারে সেই তার পুরোনো মনিবের বাসার ধারে হাজির হল।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুভ বললে, 'দেখ ভাই ভোম্বল, আমরা একটা

নতুন খেলা সুরু করেছি। এটা একটা বাজির ব্যাপার। তোকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

ভোম্বল যেন মজা পেয়েছে—এমনি ভাব দেখিয়ে উত্তর দিলে, 'তুমি বলো না শুভদা, কি করতে হবে? আমি তোমাদের সব কাজেই রাজী আছি।'

শুভ ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, 'আরে এই রকম খেলোয়াড় ছেলেই ত' আমরা চাই। শোন, তোকে কি করতে হবে।' এই যে সামনের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস্—ওইখানে গিয়ে তোকে কাজ নিতে হবে। জানবি,—এও একটা খেলা। বাড়ির কর্তার ওপর নজর রাখতে হবে। ও কখন কি করে, কোথায় যায়, আঁধার রাত-বিরেতে কাদের পেছনে ধাওয়া করে, ওর জরুরী কাগজপত্র কোথায় লুকিয়ে রাখে—তলে তলে সব খবর রাখবি। তারপর মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবি।'

ভোম্বল জবাব দিলে, 'আরে এ ত' একটা সত্যি মজার খেলা! এ কথা তুমি আমায় আগে বলো নি কেন শুভদা? তুমি দেখে নিও এই লুকোচুরি খেলা আমি দিব্যি জমিয়ে ফেলবো।'

শুভকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ভোম্বল এক ছুটে তার পুরোনো বাসায় ঢুকে গেল!

সত্যি,—এইবার খেলাও জমবে ভালো। পুরোনো মনিব বলবে—ছেলেটার ওপর কড়া নজর রাখবি! আর শুভদা বলবে—শয়তানটার সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে আমায় এসে বলবি। ভোম্বল আপন মনেই বলে উঠলো—নারদ নারদ!

ভোম্বল উঠোনে পা দিতেই বাড়ীর গিন্নী হুঙ্কার দিয়ে এসে ওর কান পাকড়ে ধরলেন—সেই যে দু'দিন আগে কাজে লেগে পালালি আর দেখা নেই! আমি ভেবে ভেবে মরি! কোথায় গিয়ে লুকিয়ে ছিলি বল্ শীগ্‌গির।

সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তা ঘর থেকে বেরিয়ে ছোঁ মেরে ওক সরিয়ে নিয়ে বললেন—আমিই একটা জরুরী কাজে ওকে পাঠিয়েছিলাম।...ওরে ভোম্বল, আয় আমার সঙ্গে।

ভোম্বলের ডান হাতটা ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে কর্তা দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দিলেন।

মাথা চুল্‌কে ভোম্বল আপন মনে ভাবতে লাগলো—এখানে আবার নতুন করে কোন্ আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে হবে!!

॥ চার ॥

ঘরের ভেতর ঢুকেই ভোম্বলের নতুন মনিবের চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেল। হাসিখুশীতে ভরে গেল সেই গুরুগম্ভীর মুখখানি।

ভোম্বলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি আনন্দের আতিশয্যে চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। তারপর একটু বাদে তার ডান হাতটা নেড়ে দিয়ে বললেন—হুঁ! খুব এলেমদার বিচ্ছু তুই। তোর কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি দারুণ খুশী হয়েছি। যে ভাবে তুই জলে ডোবার ভান করলি, তাতে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি! আমার সঙ্গে যদি লেগে থাকতে পারিস্ আর মন দিয়ে আমার কথা শুনিস্—তা'হলে পুলিশ লাইনে তোর উন্নতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হ্যাঁরে ভোম্বল, তোর মতো চৌকস ছেলেই ত আমরা চাই।

ভোম্বল মনে মনে ভাবতে লাগলো—কোন্ পথে এগুলে সাপও মরবে, আর লাঠিও ভাঙবে না। প্রথম দিকটায় কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

নদীতে নৌকো চালাতে গেলে যেমন আগে বুঝে নিতে হবে কোন্ অঞ্চলে জল গভীর, আর কোথায় চর পড়ছে, এই ঝানু লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঠিক তেমনি সাবধানে কথা বলা প্রয়োজন। তাই সে শুধু বোকার মতো কর্তার মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

কর্ত্তা ওর মুখের দিকে একবার চেয়েই বললেন, 'ও! আমি বুঝতে পেরেছি। তুই বাড়ীর গিন্নীর ভয় করছিস্? না—না, ওতে তোর কোন ভয় নেই। আরে বোকাচন্দর, বাড়ীর গিন্নীরা অমন একটু-আধটু বকাবকি করেই। তোর কানটা পাকড়ে ধরেছিল—এই ত? তা মনে কর না কেন—তোর নিজের দিদি তোকে শাসন করেছে!

তারপর খানিকটা চুপচাপ থেকে নতুন মনিব বললেন—এই নে, তোকে দুটো টাকা দিচ্ছি, নিজের ইচ্ছেমতো মিষ্টি কিনে খাস। দিদি একটু শাসন করলে কিছু মনে করতে আছে নাকি রে বোকা? ওর জন্য তুই কিচ্ছু মনে করবি না। এখন এই তক্তপোষের ওপর বোস দেখি, কাজের কথা আছে।

এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ভোম্বল। যাক, কোন রকমে একটি ফাঁড়া কাটানো গেছে। এখন নিশ্চিন্তে দু'দণ্ড বসা যাবে। নতুন মনিব কোন্ কাজের হদিস দেন সেটাও তো জানা আবশ্যক।

নতুন মনিব হঠাৎ ঘরের বন্ধ হুড়কোটা খুলে ফেললেন, তারপর চট্ করে বাইরে চলে গেলেন। খানিক বাদেই ফিরে এসে হুড়কোটা আগের মতো বন্ধ করে দিলেন।

ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—দেখে এলাম, তোর দিদি এখন কি করছে! জানিস্ তো,—মেয়েদের কানে সব কথা তুলতে নেই। জরুরী কথা যদি পাঁচ কান হয়ে যায়, তবেই সর্বনাশ। আর এসব জরুরী সরকারী কাজ। সবাইকার জানবার দরকার বা কি?

এই বলে নতুন মনিব খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন।

ভোম্বল এইবার জিজ্ঞেস করলে—আমাকে তা'হলে এখন কি করতে হবে?

—সবুর—সবুর—সব তোকে বুঝিয়ে বলবো!

মিষ্টি মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন ভোম্বলের নতুন মনিব। তারপর বললেন—আর সেই সব কাজের কথা নির্ঝঞ্ঝাটে বুঝিয়ে দেবো বলেই দরজায় হুড়কো দিয়ে বসেছি। নইলে তোর দিদি আবার কোন্ ফাঁকে এসে হাতা-খুন্তি নিয়ে হাজির হবে—তার ঠিক কি?

ভোম্বল যেন একেবারে বোকা ছেলে—ঠিক এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলে—আর সংসারের কাজকর্ম? দিদি যদি আমায় ঘর-গেরস্তালির কাজে ডাকে তা'হলে আমি কি জবাব দেবো?

হো-হো করে আবার হেসে ফেটে পড়লেন বাড়ীর কর্তা। বললেন—আরে সে জবাব দেবার জন্য ত আমি রয়েছি। এই ব্যাপারে যদি তোর দিদির হুমকি আসে, তা'হলে আমি রয়েছি কিসের জন্য? আমি সব সামলাবো। যদি কখনো বাড়ির গিন্নীর কাছে থেকে চড়্‌ট-চাপড়টা খেতে হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবি নগদ কড়কড়ে দুটো টাকা। পেট পুরে মিষ্টি খেয়ে নিবি। তখন দেখবি,—মার খাওয়ার কোন ব্যথা আর থাকবে না।

ভোম্বল সব শুনে চুপ করে রইলো; কোন কথার জবাব দিলে না। ও চুপচাপ বসে দেখতে চায়—বাড়ীর কর্তা তাঁর কথার ডিঙি কোন্ শুকনো ডাঙায় টেনে তোলেন।

নতুন মনিবের কিন্তু অদম্য উৎসাহ। সব কথা এই বিচ্ছুটাকে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান। বললেন, 'শোন, তবে বলি ঃ ওই যে ছেলেটা'—

ভোম্বল যেন কিচ্ছু বুঝতে পারে নি—এই ভাবে জিজ্ঞেস করলে—কোন্ ছেলেটার কথা বলছেন?

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন নতুন মনিব। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিলেন—আরে ওই যে শুভ ছেলেটা—যার বাড়ীতে তোকে ধরাধরি করে ছেলের দল টেনে তুললো—ওই ছেলেটাই ত' দলের সর্দার। ওই যে কথায় বলে না,—সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার পিসি? তোরও হয়েছে তাই! এইবার মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন দেখি—ওই শুভ ছেলেটাই হচ্ছে দলের গোদা!

ভোম্বল বোকার মত শুধোলে, কোন্ দল ?

নতুন মনিব ধমক দিয়ে উত্তর দিলেন—স্বদেশী ডাকাতের দল আর কি ! এখন তুই গিয়ে ওদের দলে ভালো করে মিশে যা। শুভ ছেলেটাকে গিয়ে বল—দাদা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ। তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো। আমি তোমার কেনা হয়ে রইলাম।

ভোম্বল শুধোলে—কিন্তু আমায় যদি ওরা দলে না নেয় ?

—আলবৎ নেবে !

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন নতুন মনিব—ওই ত' ওদের কাজ। নতুন চটপটে আর চালাক-চতুর ছেলে পেলেই নিজেদের দলে ভর্তি করে নেয় ; তারপর স্বদেশী ডাকাত করে তোলে।

ভোম্বল যেন ভয়ে একেবারে শিউরে উঠেছে—ঠিক সেই রকম ভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে আমার গতি কি হবে কর্তা ?

কর্তা এইবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, 'তোর কোনো ভয় নেই। সেজন্য রইলাম আমি। তোর যদি বিপদ হয় ত' আমি তোকে বাঁচিয়ে দেবো। এখন সোজা চলে যা ওদের বাড়ি। শুভর হাতে-পায়ে ধরে দলে ভর্তি হয়ে যা। ওরা কি বলে, কি করে, রাত্তিরের আঁধারে কোথায় যায়—সব ভালো করে দেখবি। তারপর মাঝে মাঝে এসে সব খবর আমায় জানিয়ে যাবি। বুঝলি ?'

ভোম্বল আকুপাকু করে ওঠে—কোথা দিয়ে যাবো ? বাইরে বেরুলেই ত' দিদি খপ্ করে আমায় ধরে ফেলবে !

আবার হো-হো করে হেসে ওঠেন নতুন মনিব ; বললেন, 'দূর বোকা ! পেছনকার দরজা রয়েছে না ! আমি খুট্ করে খুলে দি, তুই ফুট্ করে বেরিয়ে যা।

ভোম্বল মুখ লুকিয়ে হাসি গোপন করে। তারপর চট্ করে পেছনকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ও বাড়ি ফিরে গিয়ে ওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না।

শুভ আর শুভা—দুই ভাই-বোন যেন ওৎ পেতে বসেছিল।

ভোম্বল গিয়ে হাজির হতেই শুভ জিজ্ঞেস করলে—কি রে, ওখানে চাকরি জুটলো ?

ভোম্বল জবাব দিলে—হ্যাঁ, চাকরি একটা জুটিয়ে এসেছি।

সাবাস ! আমি বলি নি—ও একটা হীরের টুকরো ?—বললে শুভ।

সঙ্গে সঙ্গে শুভা ফোঁস্ করে উঠলো—বাঃরে দাদা সে-কথা তুমি আবার কখন বললে ? সে-কথা ত বললাম আমি।

—আচ্ছা না হয় তুইই বলেছিস্। এখন ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়।

শুভা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে ভোম্বল আমাদের দলের লোক হবে কি করে ?

শুভ বললে, 'তা'হলে আমি চলি ! আমার হাতে এখন অনেক কাজ জমে আছে। সব কিছু বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব তোর ওপর রইলো !

শুভা উত্তর দিলে—সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা !

শুভ চলে যেতে শুভা বললে, 'ওরে ভোম্বল, বোস্ এই দাওয়াটার ওপর।'

ভোম্বল জবাব দিলে—তা না হয় বসছি দিদি। কিন্তু কতকগুলো শক্ত কথা আমার মগজে ঢুকিয়ে দেবার আগে—পেটে কিছু দেবার ব্যবস্থা করো। উদরে যে ইঁদুর ডন দিচ্ছে—

ভোম্বলের কথা বলবার ধরণ দেখে শুভা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো, তারপর চট্ করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

একটু পরে সে ফিরে এলো একটা বাটি গরম মুড়ি আর প্যাঁজের বড়া নিয়ে। তারপর ভোম্বলের হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'এখন এগুলো পেটে সেঁধিয়ে দে। তারপর রান্না হয়ে গেলে গরম ভাত, মাছের ঝোল আর দুধ খেতে দেবো।

ভোম্বল উত্তর দিলে—এখন গরম মুড়ি আর প্যাঁজের বড়া। তারপর মাছের ঝোল আর ভাত; তারপর দুধকলা! ওরে বাব্বা! এত সুখ কপালে সইলে হয়। দিদি, তুমি আমায় একেবারে পোষা বানরটি করে তুলবে দেখছি।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগলো।

ভোম্বল খাচ্ছে আর শুভা ফিস্-ফিস্ করে বলে চলেছে—শোন ভোম্বল, তোকে আমাদের দলে নিয়ে নেবো। ওই যে দুষমনটা—যার বাড়িতে আজ তুই চাকরি নিলি—ও হচ্ছে পুলিশের টিকটিকি। স্বদেশীদের পিছু নিয়ে ওদের ধরিয়ে দেওয়াই ওর কাজ। এই কাজ প্রতি পদে ভণ্ডুল করতে হবে। আর তুই—ভোম্বল ভাই—তুই হবি আমাদের সহায়।

ভোম্বল খুশী হয়ে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—তোমার মতো একটি দিদি যদি আমি পাই, তা'হলে কোনো কাজেই আমি পেছ-পা হবো না—এই কথা তুমি জেনে রাখো। এখন কী আমায় করতে হবে—সব ভালো করে বুঝিয়ে বলো দেখি দিদি !

শুভা বললে, 'আজ রাত্তিরের গোপন আঁধারে দাদারা একটা জরুরী কাজ করতে যাবে। আমরা খবর পেয়েছি, ওই শয়তানটা লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের অনুসরণ করবে। তা'হলেই সব কাজ পণ্ড হবার সম্ভাবনা। তুই ত' ওখানে চাকরি নিয়েছিস্, তোকে শয়তানটা কিছুতেই সন্দেহ করবে না। যে করেই হোক—ওই দুষমনটাকে

ওদের পিছু নেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে হবে—ছলে হোক, বলে হোক, আর কৌশলেই হোক! তুই পারবি নে ভাই?

ভোম্বলের মুড়ি খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। সে ঠকাস্ করে বাটিটা দাওয়ার ওপর রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বললে—নিশ্চয়ই পারবো দিদি! এইটুকু মজার কাজ না পারলে, তোমরাই বা আমাকে তোমাদের দলে নেবে কেন?

ভোম্বলের কথা শুনে শুভার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ধরা গলায় সে বললে—এই রকম একটি ভাইয়ের জন্য আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল রে ভোম্বল, তা ভগবান তোকে জুটিয়ে দিয়েছেন।

ভোম্বল শুভার পায়ের ধূলো নিয়ে সোজা রওনা হল।

শুভা পেছু ডেকে বললে, 'ওরে পাগল ছেলে, আমার রান্না আর একটু বাদেই হয়ে যাবে, তুই মাছের ঝোল-ভাতটা খেয়ে যা।

ভোম্বল জবাব দিলে, 'কাল হবে দিদি! আজ আগে কাজ হাসিল করি।

ভোম্বল ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

গভীর রাত।

ভোম্বল তার নতুন মনিবের বাইরের ঘরে শুয়ে আছে কিন্তু ওর চোখে ঘুম নেই।

শুভা দিদির কাছে বড়-মুখ করে বলে এসেছে—কাজ সে হাসিল করবেই। কাজেই ঘুমুলে চলবে না।

অসংখ্য মশা তাকে ছেঁকে ধরেছে। এ যেন ওর শাপে বর হয়েছে।

এই আঁধার রাতে মশার দলই ভোম্বলকে জাগিয়ে রাখবে। সে শুধু বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে আর নীরবে প্রহর গণনা করছে।

দূরে কোন বনের আড়ালে একদল শেয়াল ডেকে উঠলো। একটা নিশাচর পাখী কর্কশকণ্ঠে ডেকে ঘরের ওপর দিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার ঘরে বোধ করি গোটা কয়েক বাদুড় ঢুকেছিল। তাদের ক্রমাগত ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

একটু বাদেই একটা খুট্-খুট্ আওয়াজ শুনে ভোম্বল সচেতন হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, বাড়ির কর্তা এসে সেই আঁধার ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর হাতে টর্চ। সেই টর্চের আলোতে বাড়ির কর্তা বড় একটি কাঠের আলমারী খুলে একটা রিভলবার পকেটে পুরে নিলেন।

ভোম্বল বুঝতে পারলে, তার নতুন মনিব শুভদার দলকে অনুসরণ করতে চলেছে। পেছনকার দরজাটা খুলে আবার ভেজিয়ে দিয়ে কর্তা আঁধারে এগিয়ে যেতেই ভোম্বল লাফিয়ে উঠলো তার বিছানা থেকে।

তারপর সেও আঁধার রাতে শিকারী বেড়ালের মতো ওর পেছু পেছু চললো।

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে ভোম্বলের মনে হল—কে যেন তাকে আচমকা রাশি রাশি কালো ধোঁয়ায় মধ্যে ঠেলে দিলে।

এই অন্ধকারের মধ্যে কি করে সে তার নতুন মনিবের পেছু নেবে? তা ছাড়া ওর আরও একটা অসুবিধে যে, সে এ অঞ্চলে একেবারে নতুন। রাস্তা-ঘাট কিছুই তার জানা নেই।

তবে কি সে এই লুকোচুরি খেলায় হেরে যাবে?

না না, তা কখনই হতে পারে না।

শুভা দিদির কাছে সে মাথা উঁচু করে বড়-গলায় বলে এসেছে—যেমন করেই পারে, কাজটা সে হাসিল করবে। আর না করবেই বা কেন?

আসলে যে ওরা এক দলের লোক—দেশকে ভালোবেসেই ওরা ঘরের মায়া ছিঁড়ে দিয়ে পথের টানে বেরিয়ে এসেছে। ওদের আদর্শ এক—উদ্দেশ্য এক।

মহান্ ব্রত নিয়ে একই পথে তাদের হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। সার্থক করতে হবে তাদের তপস্যা।

পুলিশের টিকটিকিরা যতই তাদের স্বদেশী ডাকাত বলে গালাগাল দিক, ওরা কখনই সত্যভ্রষ্ট হবে না. আর তাদের আদর্শের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ভোম্বলের নজরে পড়লো যে তার মনিবের টর্চটি মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে আর তাতেই পথের নিশানা পাওয়া যাচ্ছে।

ভোম্বল মনে মনে বললে, 'যাঁহা মুস্কিল—তাঁহা আসান'।

আর ওর কোন ভয় নেই।

ওর মনিব টর্চ জ্বালাবে—নিজের পথ দেখে নেবার জন্য। আর সেই ক্ষণিক দেখা আলোর সাহায্যেই ভোম্বল ওকে দিব্যি অনুসরণ করতে পারবে।

মনের আনন্দে ভোম্বল গলা খুলে একটা গান গাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু তক্ষুণি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চট্‌পট্ নিজেকে সামলে নিলে।

এক লহমার ভুলে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি !

ধরা দিতে সে তখুনি রাজী—যখন তার আসল কাজ হাসিল হয়ে যাবে !

কাজেই সে শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে আর আলোটাকে অনুসরণ করে ঠিক এগিয়ে যেতে লাগলো।

এই ভাবে বেশ খানিকটা দূর ওরা চলে গেল।

তারপর সুরু হল ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড়।

একটা পুরোনো গাছের একটা শেকড় আঁকাবাঁকা ভাবে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি চলে গেছে, সেটা ভোম্বল আদপেই টের পায় নি অন্ধকারের জন্য। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলে নিলে।

ওদিকে নতুন মনিব পায়ের শব্দে চমকে উঠে বলেন, 'কে ?'

ভোম্বল কোন রকম শব্দ না করে—চট্ করে সেই গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

আর একটু হলেই ধরা পড়েছিল আর কি ! নাঃ—গানের সুর মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। সাবধানে পথ না চললে বিপদের সম্ভাবনা।

শুভা দিদির কাছে তা'হলে আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না।

তারপর টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চলেন মনিব, আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে অনুচর।

এই ভাবে আরো কিছু দূর চলবার পর ঘন বন সুরু হল।

মনিবের কিন্তু চলার বিরাম নেই।

ভোম্বল মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে—আজ রাত্রে নেহাৎই সাপের কামড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি।

এমন সময় অন্ধকার বনের ভেতর থেকে একটা বাঁশী বেজে উঠলো। ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলে বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনিব দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পকেট থেকে একটা বাঁশী তুলে নিয়ে তিনি সেই ডাকের সাড়া দিলেন।

একটু বাদেই কয়েকটি ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল।

নতুন মনিব টর্চটা উঁচু করে ধরলেন। সেই আলোতে দেখা গেল—কয়েকটি ষণ্ডা-গোছের লোক মনিবের সামনে এসে তাঁকে স্যালুট করে দাঁড়ালো।

তিনি ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব খবর ঠিক ঠিক নিয়েছ ত' ?

একটি লোককে দেখে মনে হল, সে-ই দলের গোদা। আবলুস কাঠের মতো চেহারা তার। তাদের কারো গায়েই পুলিশের পোষাক নেই।

দলের গোদাটা এগিয়ে এসে বললে, 'হুজুর, আমরা সব খবর নিয়েছি। ওরা

একটা বড় নৌকো ভাড়া করেছে। কয়েকটা বন্দুক আর লাঠি-সোটাও যোগাড় করেছে।'

ওর মনিবকে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হল। বললেন, 'হুঁ! কিন্তু কোন্ ঘাটে ওরা নৌকো রেখেছে সে খবর নিয়েছিস্ ?'

লোকটি আবার সেলাম করে জবাব দিলে, 'আমার কাজে কোন গাফিলতি পাবেন না হুজুর! সব পাত্তা আমি নিয়ে এসেছি। ওরা আঘাটায় নৌকো লাগিয়ে রেখেছে হুজুর। লোকজন সব এসে পড়ে নি। শুধু মাঝি-মাল্লারা নৌকোর ভেতর রয়েছে হুজুর। এখুনি যদি চড়াও হই হুজুর, তা'হলে বন্দুকগুলো ছিনিয়ে নিতে পারি। আপনি কি হুকুম করেন হুজুর ?'

মনিব সঙ্গে সঙ্গে ওদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'না না, এখন নৌকোয় চড়াও হতে হবে না।' আগে ওরা আসুক—সবাই নৌকোয় উঠুক। আমরা আর একটা নৌকো নিয়ে ওদের পেছন পেছন যাব। একেবারে হাতে-নাতে ধরতে হবে শ্রীমানদের। তা'হলে বন্দুক আর মানুষ—সব একসঙ্গেই গ্রেপ্তার করা যাবে।

সেই দুষমনের মতো লোকটা সেলাম করে বললে, 'সেটা খুব সাচ্চা বাৎ হুজুর! আমরা তা'হলে ওদের পিছু পিছু যাবো ?'

মনিব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা একটা নৌকো যোগাড় করেছিস ? না হলে পিছু পিছু যাবি কি করে ?'

কালো দুষমন লোকটা সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সবগুলো দাঁত বের করে ফেললে। উত্তর দিলে, 'রামলগন কাঁচা কাজ করে না হুজুর! আমি আলাদা নৌকো ভাড়া করে একটা ঝোপের মাঝে লুকিয়ে রেখেছি হুজুর!

ওর কথা শুনে মনিব খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। এগিয়ে গিয়ে কালো দুষমন- টার পিঠে চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস!'

তারপর ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। হাতের আঙুল-গুলো দিয়ে কপালে যেন জল-তরঙ্গ বাজাতে লাগলেন।

হঠাৎ ওদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দ্যাখ, আমি ভেবে দেখলাম—সবাইকার এখানে থাকবার দরকার নেই। একা রামলগন আমার সঙ্গে থাক। বেশী লোক নৌকোয় ভীড় করলে ওরা আবার সন্দেহ করতে পারে। আমরা মহাজনের মতো জামা-কাপড় পরে ওদের পেছন পেছন ধাওয়া করবো। তোরা বাদ-বাকি লোক থানায় গিয়ে চুপচাপ পড়ে থাক। ভোরবেলা জল-পুলিশের লঞ্চ নিয়ে—যেখানে বলেছি—ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির থাকবি।

ভদ্রলোকের আদেশ শুনে রামলগন ছাড়া বাদ-বাকি লোক তাঁকে সেলাম জানিয়ে অন্ধকার বনের ভেতর চুপচাপ মিলিয়ে গেল।

ভদ্রলোক এইবার এক্‌টা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ আপনমনে টানলেন।

সেই সিগারেটের ক্ষীণ আলোতে মনে হল তিনি ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। নানা কথা তাঁর মগজে ভীড় জমিয়েছে।

তিনি ওইখানেই পায়চারী শুরু করে দিলেন।

রামলগন প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত নতুন কোনো আদেশের প্রতীক্ষায় ছিল।

হঠাৎ সে বলে বসলো—হুজুর, ওদের সবাইকে চলে যেতে বললেন, আমরা দু'জন ওদের এতগুলো মানুষকে কি করে সামলাবো হুজুর?

ভদ্রলোক একটুখানি হেসে উত্তর দিলেন, 'সেজন্য ভয় নেই রে! সেখানে স্থানীয় লোকদের খবর দেওয়া আছে। আমি গিয়ে বাঁশী বাজালে তারা সবাই এগিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করবে।

কর্তার কথা শুনে রামলগন খুশী হয়েছে বলে মনে হল।

সে খৈনী টিপতে টিপতে ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলো।

খানিক বাদে রামলগন বললে, 'হুজুর, নৌকোটা একবার দেখবেন চলুন। আমাদের নৌকোটা থেকে ওদের নৌকোটাও দেখতে পারবেন। লেকেন—ওরা আমাদের খবর কুছু টের পাবে না।

নতুন মনিব খুশী হয়ে বললেন, 'তাই চল রে রামলগন। এখানে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বনের যত মশা এসে আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরেছে।

রামলগন উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—চলিয়ে হুজুর!

তখন প্রভু আর ভৃত্য সেই বনপথ ধরে এগিয়ে চললো।

আর ভোম্বলও বাধ্য ছেলের মতো তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হল।

বনের ভেতর গাছের জড়াজড়ি। কোথাকার শেকড় কোন পথে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছে—কিচ্ছু বোঝবার যো নেই।

তা ছাড়া ওপর থেকে আবার বটগাছের বড় বড় ব' রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে মাথার মোলাকাৎ হয়।

এতটুকু 'উঃ' বলবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। একেবারে প্রভুভক্ত কুকুরের মত ভোম্বল মনিবকে অনুসরণ করে চলেছে।

আরও কিছুদূর এই ভাবে চলবার পর ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হল। বন-জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে; সামনে একেবারে অবারিত মাঠ—গগন ললাট!

সামনেই ধানের ক্ষেত। ক্ষেতে প্রচুর ফসল ফলেছে।

মাথার ওপর রাশি রাশি নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রের আব্‌ছা আলোতে দেখা গেল

—ধানগুলো বাতাসে হেলছে দুলছে—শেষ-রাতের হাওয়ার সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলছে!

ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু আলোর পথ। এবার সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

ওরা দু'জনে চলেছে আগে আগে আর ভোম্বল মাথা নীচু করে ওদের পেছন পেছন।

বেশ খানিকটা হাঁটবার পর আবার ঝোপ-জঙ্গলের ভীড়।

ঝোপ-জঙ্গলের পাশেই নদী। নদীর খাড়া পাড়—জল অনেক নীচে।

ওরা তাকিয়ে দেখলে, দূরে একটা বড় নৌকো বাঁধা আছে।

টিম্-টিম্ করে আলো জ্বলছে সেই নৌকোতে। মাঝির হাব-ভাব দেখে মনে হল, সে যেন কাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। উঁচু পাড়ের দিকে সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর নৌকোর পাটাতনের ওপর পায়চারী করছে।

এদিকে সামান্য দূরে আর একটি নৌকোর খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর নৌকোটা লুকোনোই আছে বলা চলে। আকারে খুবই ছোট—তর্‌তর্ করে বেয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমনি হাল্‌কা নৌকো। ছোট্ট একটা ছইও আছে নৌকোটাতে।

ভোম্বল বড় নৌকোটার দিকে তাকিলে রইলো।

হ্যাঁ, অনেকগুলো মানুষ উঁচু পাড় ধরে এগিয়ে আসছে। তাদের নজর যে বড় নৌকোটার দিকে—সেটা ওদের চলা দেখেই বোঝা গেল।

অতগুলো মানুষকে বড় নৌকোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ভোম্বলের নতুন মনিবও বেশ সচেতন হয়ে উঠলেন। পকেট থেকে একটা বাইনাকুলার বের করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগলেন।

এইবার উঁচু পাড় থেকে ওরা এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে নীচের দিকে নামতে লাগলো।

মানুষগুলোকে নামতে দেখে নৌকোর মাঝি আলোটা তুলে ধরে দোলাতে লাগলো।

দলটা ততক্ষণে নিঃশব্দে বড় নৌকোটার কাছে পৌঁছে গেছে।

সেই আব্‌ছা আলোয় ভোম্বল দেখলে, ওদের দলের প্রথম যে মানুষটি সে শুভদা ছাড়া আর কেউ নয়। দেখে ওর বুকটা টিপ্‌-টিপ্ করতে লাগলো।

হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে মনিবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, 'কর্তা, এক্ষুণি বাড়ি ফিরে চলুন,—আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

কর্তা প্রথমটা একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলেন ; তারপর ওকে চিনতে পেরে বললেন ভোম্বল—তুই ? কিন্তু আমি যে এখানে আছি তুই জানলি কি করে হতভাগা ?'

ভোম্বল বললে, 'থানা থেকে জেনে নিলাম কর্তা। কথা কাটাকাটি পরে হবে কর্ত, শীগ্‌গির চলুন। দিদি ঠাকরুণকে সাপে কামড়েছে। ওঝা ডাকতে হবে।'

॥ ছয় ॥

বাড়ির কর্তাকে বাড়ির ভেতর সেঁধিয়ে দিয়ে ভোম্বল বললে, 'কর্তা, আপনি দিদিমণিকে ততক্ষণ একটু দেখুন। আমি ওঝা ডেকে নিয়ে আসি। নইলে এ যাত্রায় দিদিমণিকে আর বাঁচানো যাবে না।

কর্তাকে আর কিছু বলবার ফুরসৎ না দিয়ে ভোম্বল বাড়ির দোরগোড়ো থেকেই এক ছুটে পালিয়ে গেল।

কর্তার একে মোটা শরীর, তার ওপর সাপের কামড়ের খবর পেয়ে গল-গল করে কেবলি ঘামছিলেন। কোথায় একদল স্বদেশী ডাকাতের পেছনে ছুটবেন—তা নয় কি না—গিন্নীকে একেবারে এই অসময়ে সাপে কেটে বসলো।

কর্তা মনে মনে আঁচ করে বসেছিলেন,—এই ডাকাতদলকে হাতে-নাতে ধরতে পারলে একটা বড় রকম প্রমোশন হবে। মাইনেও প্রায় ডবল হয়ে যাবে। মনে মনে আবার ভারী বিরক্ত হয়েছেন কর্তা। সাপ-ব্যাটাও যেন কামড়াবার আর সময় খুঁজে পেলে না। কামড়াবি—না হয় দু'দিন পরে ধীরে-সুস্থে কামড়া। তা'হলে ত আর এমন করে কর্ম-ভণ্ডুল হয় না!

হন্তদন্ত হয়ে সিধে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন কর্তা।

এ কী! খাটের ওপর যে একেবারে এলিয়ে শুয়ে পড়ে আছে তাঁর গিন্নী!

তবে কি দেহে আর প্রাণ নেই!

কী ফ্যাসাদেই পড়া গেল—এই শেষরাত্তিরে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন এলিয়ে-পড়া দেহটির কাছে। নাকের কাছে আঙুল ধরে কর্তা বোঝবার চেষ্টা করলেন, দেহে প্রাণ আছে কিনা। তারপর কপালের ওপর হাত রাখতেই গিন্নী নড়ে চড়ে উঠে বসলেন!

গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন—এ কি! তুমি আবার কখন ফিরে এলে? এই-না কোন্‌ জরুরী কাজে বেরিয়ে গেলে খানিকক্ষণ আগে?

গিন্নীকে সহজভাবে কথা বলতে দেখে কর্তার দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো।

বিরক্তিভরা গলায় মন্তব্য করলেন—যেতে আর পারলাম কোথায়? তোমাকে আবার এই সময়ে সাপে কামড়ালো! তাই ত খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম বাসায়।

এইবার গিন্নীর অবাক হবার পালা। ভুরু কুঁচকে ফোড়ন কেটে তিনি বললেন—কি যা-তা বলছ? আমায় আবার সাপে কামড়ালো কখন?

কর্তা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—তা'হলে সাপে কামড়ায় নি তোমাকে? ওই ভোম্বল ছোঁড়া যে ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো!

গিন্নী এইবার আরো অবাক হলেন; বললেন, 'কি আশ্চর্য্য! ওই ভোম্বল গিয়ে তোমায় বললে—আমাকে সাপে কামড়েছে? কোথায় গেল সে ছোঁড়া? আমি ঝেঁটিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দেবো না? ডাকো আগে সেই ছোঁড়াকে!'

কর্তা তখন আরো চটে গেছেন; হুঙ্কার দিয়ে বললেন—হুঁ! সে ছোঁড়া কি আর আছে? আমায় বাড়িতে সেঁধিয়ে দিয়েই বললে, আমি তাড়াতাড়ি ওঝা ডেকে নিয়ে আসি, আপনি ততক্ষণ দিদিমণিকে একটু দেখুন।

—কি বিচ্ছু ছেলেরে বাবা! এ যে মানুষ মেরে একেবারে পোকা খরিয়ে দিতে পারে!

কর্তা তক্ষুণি ছুটে বেরুলেন রাস্তায়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু বিচ্ছু ভোম্বলকে আর সে তল্লাটে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আর খুঁজে পাওয়া যাবেই বা কি করে?

ভোম্বল ততক্ষণে শুভাদির সঙ্গে বসে গল্প করছে আর আপন মনে হাসছে!

কি করে সে জাঁদরেল কর্তাটিকে জব্দ করেছে রসিয়ে রসিয়ে ভোম্বল সেই গল্পই করছিল।

শুভাদি ওর গল্প শুনে হেসে আর বাঁচে না; বললে—আচ্ছা, তুই কি দুষ্টু ছেলে রে ভোম্বল, একেবারে সরাসরি বলে দিলি যে, বাড়ির গিন্নীকে সাপে কামড়েছে!

ভোম্বল তেমনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—আমি কি ভেবে-চিন্তে কিছু বলেছি নাকি শুভাদি? আমার মাথায় কেবলি ওই কথাটা ঘুরছে যে, যে করেই হোক—কর্তাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর চোখের সামনে দেখতে পেলাম,—শুভদারা দল বেধে ওদের নৌকোয় গিয়ে উঠছে। এদিকে কর্তাও ওদের পেছন পেছন রওনা হবার জন্য প্রস্তুত। সঙ্গে রয়েছে গোলা-গুলী-লাঠি-সোটা বন্দুক। কাজেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না হয়ে যায় না।

তা ছাড়া শুভদারা এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশের স্বাধীনতার জন্য, আর আমার কর্তা যাচ্ছেন ওদের সব রকমে বিপদে ফেলবার জন্য। তাই

মাথায় খেলে গেল,—যে করেই হোক কর্তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। চট্ করে মগজে একটা বুদ্ধি এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম—কর্তা, শীগগির চলুন, দিদি ঠাকুরুণকে সাপে কামড়েছে। ওঝা ডাকতে হবে।

ওর কথা শুনে আর ওর বলবার ধরণ দেখে শুভাদি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো ; বললে, 'সাবাস ভোম্বল, সাবাস। তোর উপস্থিত-বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।'

ভোম্বল বললে, 'শুভাদি, বসে বসে ত' পায়ে বাত ধরে গেল। শুভদা কখন ফিরবে কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

শুভাদি উত্তর দিলে—এই সন্ধ্যের মুখেই ফিরে অসবে। তুই এত উতলা হয়েছিস্ কেন ? জলে ত আর পড়িস্ নি! বোস না একটু ভাল করে।

ভোম্বল বললে, 'ভাল করে বসতে ত চাইছি। ও বাড়ীতে ত' আর যাবার যো নেই। গেলেই সোজা থানায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এদিকে যে পেটে ইঁদুর ডন ফেলছে—তার কি করি বলো ?

শুনে খিলখিল্ করে হেসে উঠলো শুভাদি। চোখে-মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। বললে, 'ও! খিদে পেয়েছে তোর ? তাই বল। এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি। একটু আগে বলবি ত!'

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল শুভাদি! খানিক বাদেই এক বাটি দুধ, তার ভেতর খানিকটা মুড়ি-মুড়কি আর একটি মর্তমান কলা নিয়ে এসে হাজির। এসে বললে—বেশ করে মেখে নিয়ে ফলার করে ফেল। তারপর দুপুরবেলা মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে দিব্যি এক লম্বা ঘুম। বিকেলে ঘুম ভাঙলে পাবি একবাটি চা। তারপর বোধ করি তোর শুভদার সঙ্গে দেখা হবে।

ভোম্বল খুশী হয়ে বললে, 'তা প্রোগ্রামটা ত' মন্দ করো নি শুভাদি। ও বাসায় থাকলে এতক্ষণ ঝাঁটা পেটা খেতে হতো! তার পর এক গাদা বাসন মাজতে হতো। হাতে-পায়ে হাজা হয়ে যেতো আর কি!'

শুভাদি ফোড়ন কাটলে—তা যা বলেছিস্!

সারাদিন শুধু খাওয়া আর ঘুমের ভেতর দিয়ে সময়টা মন্দ কাটলো না ভোম্বলের। ভাবলে, এই রকম নিশ্চিন্ত আয়েশে যদি দিনগুলো কেটে যেতো ত' নেহাৎ মন্দ হতো না।

সন্ধ্যের মুখে শুভদা এসে হাজির। দলবল সঙ্গী-সাথী আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই একসঙ্গে ফেরে নি ওরা। তা'হলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

শুভদার হাসি-হাসি মুখ দেখে আর কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল—যে কাজে ওরা সদলবলে রাতের আঁধারে রওনা হয়েছিল, তা সকল দিক থেকেই সফল হয়েছে।

শুভদা যখন শুভাদির কাছে শুনল—কি করে ভোম্বল ওই দুষমনটাকে মাঝরাস্তা থেকে ফিরিয়েছে তখন খুব খুশী হয়ে সে ভোম্বলের পিঠ চাপড়ে দিলে।

তারপর বললে, 'সাবাস—বাহাদুর সাবাস! তুই আমাদের দলে একদিন সত্যি নাম কিনতে পারবি। কিন্তু এই অঞ্চলে তোর আর থাকা হবে না।

—কেন শুভদা ?

—বুঝতে পারছিস্ নে,—ওই দুষমনটা কি তোকে সহজে ছাড়বে ? ধরে নিয়ে গিয়ে তোকে সোজা হাজতে পুরে দেবে। দুর্জন থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

—তা'হলে আমি কোথায় যাবো শুভদা ?

—আজ রাতেই আমাদের একজন বিশ্বাসী দাদা তোকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে।

—কোথায় নিয়ে যাবে শুভদা ?

—সে-কথা আমরা কেউ জানতেও চাইবো না, শুনতেও চাইবো না। এই আমাদের বিপ্লবী দলের নিয়ম।

ভোম্বল তাড়াতাড়ি জবাব দিলে—ঠিক কথা শুভদা! সে নিয়মের কথা আমিও জানি। হঠাৎ কেমন ভুল হয়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করে বসলাম।

শুভদা জবাব দিলে, 'এখন থেকে আর জিজ্ঞেস করো না। আমরা শুধু আদেশই পালন করবো। কোনো কারণ জিজ্ঞেস করবো না।

ভোম্বল মাথা নেড়ে বললে, 'ঠিক কথা শুভদা!

শুভদা তখন ওর পিঠ চাপড়ে ওকে উৎসাহ দিলে। তারপর ধীরে ধীরে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'সন্ধ্যে রাতেই খাওয়া দাওয়া সেরে এক ঘুম লাগা। তারপর সময় মতো আমি তোকে ডেকে দেবো।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশীমনে ভোম্বল শুভাদির সঙ্গে গিয়ে গল্প সুরু করে দিলে।

গভীর রাতে শুভদা এসে ভোম্বলকে ডেকে তুললে।

সুটকেস গোছাবার ব্যাপার নেই, বিছানা বাঁধবার তাড়া নেই। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল।

তারপর যে মানুষটির কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো—তাঁকে দেখেই ভোম্বল আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

—এ কি! জীবনদা—আপনি!

জীবনদা তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন—হ্যাঁরে আমি। তোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এলাম। আমাদের বেশীদিন এক জায়গায় থাকবার হুকুম নেই। এখন তোর ওপর নতুন কাজের ভার পড়েছে।

ভোম্বল জানে না—কোথা থেকে হুকুম আসে। কার নির্দেশে তাদের দাবার খুঁটির মতো নিঃশব্দে এখান থেকে ওখানে সরে যেতে হয়। তবে এই কথাটুকু শিখে রেখেছে, 'আদেশ পালন করতে হবে ঃ "এসেছে আদেশ বন্দরের বাস হলো শেষ।"

এখন নোঙর তুলতে হবে। নতুন পথে এবার পাড়ি জমাতে হবে। তাই শক্ত হাতে ধরতে হবে হাল। তুলে দিতে হবে পাল।

জীবনদার হাত ধরে সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ভোম্বল।

কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো কৌতূহল নয়, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আদেশ পালন করতে হবে।

এবার আর নৌকো-পথে নয়। ট্রেনে যেতে হবে, 'অনেক দূরের পাড়ি।'

জীবনদার ভূমিকা এবার চা-বাগানের আড়কাঠি। ভোম্বলকে জোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছে, 'চা-বাগানে কুলির কাজ করবে বলে।'

পথে যেতে যেতে এক ঝোপের আড়ালে সেই রকম বেশভূষা করে নিল দুইজনে।

ট্রেনে উঠে জীবনদা কেবলি বিড়ি টানছেন আর হিন্দি ভাষায় চা-বাগানের গুনগান করে চলেছেন ঃ ওখানে গেলে যে লোকে কি সুখে থাকবে তার আর সীমা নেই, 'যেন দুধে স্নান আর মধু পান!'

চা-বাগানের মতো স্বর্গপুরী আর নাকি ত্রিভুবনে নেই!

সেখানে যারা থাকে, 'চার বেলা করে খাবার পায়। শুধু সময়মতো একটু একটু গাছের পাতা তুললেই হল। খাও দাও, বেড়াও আর যখন তখন ঘুমিয়ে পড়। বকবার ঝকবার কেউ নেই! একেবারে নাত-জামায়ের আদরে দিন কাটাও।

নানা জায়গা ঘুরে তিনদিন পর ওরা আসাম অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল।

অন্ধকার রাত। একটা নিরালা ষ্টেশনে নেমে ওরা দু'জনে হাঁটতে সুরু করে দিলে। মাইল দুয়েক চলবার পর ওরা চা-বাগানের পাশে একটা পান-বিড়ির দোকানে এসে হাজির হল। দোকানে টিম্‌টিম্ করে আলো জ্বলছে।

জীবনদা ভোম্বলের কানে কানে বললেন, 'এইখানেই তোমায় থাকতে হবে। এটা আমাদের একটা ঘাঁটি।'

ভোম্বল ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে আমার কাজ কি হবে?

জীবনদা বললেন, 'এই দোকানের পেছন দিকে আমাদের রিভলবার লুকিয়ে রাখবার গোপন ঠাঁই। কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে তেলাকুচ পাওয়া যায়?,

—'তা'হলে বুঝে নিতে হবে সে আমাদের দলের লোক। দোকানী সব তোকে শিখিয়ে দেবে। খুব সাবধানে থাকবি। আমি চললাম।

সেই আঁধার রাতে জীবনদা কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন।

ভোম্বল সেই দোকানটার সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এখন কি করি ?

॥ সাত ॥

ভোম্বল যে সেইখানে কতক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল সেটা তার নিজেরই খেয়াল নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে কার কথায় তার চমক ভাঙল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, একটা ছেঁড়া ফতুয়া পরনে, আর ধুতিটাও তেমনি নোংরা আর ময়লা, 'এই রকম অপূর্ব বেশের একটি লোক দাঁত বের করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পাগল-টাগল নয় ত ?

ভোম্বলের নিজেকে বড় একলা একলা মনে হল।

দোকান থেকেও ত' কেউ বেরুচ্ছে না!

সারারাত কি সে এই খানেই অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে ?

জীবনদার রহস্যময় ব্যাপারটাও সে ভালো করে বুঝতে পারলে না।

এই রকম অজানা-অচেনা জায়গায় তাকে একা দাঁড় করিয়ে রেখে জীবনদা যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন সেটাও সে ভালো করে বুঝে উঠতে পারলে না। শুধু এইটুকু বুঝেছে বিপ্লবের পথ ফুলে ঢাকা পথ নয়। এখানে কোথায় যে কোন্ রহস্য লুকিয়ে থাকে কেউ তার সন্ধান রাখে না।

সে বাংলাদেশের এক অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে; সংসারের বন্ধন বলতে তার এক রকম কেউ নেই। অপরের দয়ায় পড়তে এলো বাবুইবাসা বোর্ডিংএ। তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতো কোথায় যে ভেসে চলেছে তা সে নিজেই জানে না।

পেছন ফিরে দেখলে, 'সেই লোকটা তখনো পাগলের মতো দাঁত বের করে হাসছে।

এই সময় দোকানীটাও যদি বেরুতো তা'হলে ভোম্বল এই অসহায় অবস্থা থেকে বোধ করি বেঁচে যেতো।

সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটা ততক্ষণে তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

ভোম্বল মনে মনে ভাবলে এই নিশুতি রাতে অজানা-অচেনা জায়গায় ত 'ভালো ফ্যাসাদে পড়া গেল!

ভোম্বলের একবার মনে হলো, 'এক্ষুণি ছুট লাগাই। পরদিন সকালবেলা এসে না হয় দোকানের মালিকের সন্ধান করা যাবে।

কিন্তু লোকটা হঠাৎ তার পাগলের মতো হাসি থামিয়ে ফিস্‌-ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলে, এখানে তেলকুচ পাওয়া যায়?

এতক্ষণে যেন ভোম্বলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

যাক লোকটি তা'হলে সত্যি পাগল নয়। জীবনদার কথা ওর মনে পড়ে গেল।

তেলাকুচের কথা যখন জিজ্ঞেস করেছে তখন নিশ্চয়ই বিপ্লবী দলের বিশ্বাসী মানুষ।

ভোম্বল শুধু অতি আনন্দে নিজের ঘাড় নাড়লে। লোকটি আবার পাগলের মত হেসে উঠল, তারপর খপ্‌ করে ভোম্বলের ডান হাতটা ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান মেরে বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

পর মুহূর্তেই দু'জনে সেই অন্ধকারে রাত্তিরে ছুট্‌ লাগাল।

ছুটতে ছুটতে পাগল জিজ্ঞেস করলে, 'ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

সত্যি ভোম্বলের ক্ষিদে পেয়েছিল; কিন্তু সে তার কথার কোনো উত্তর দিলে না। ওর এক হাত ধরা। সেই ভাবেই সে নিঃশব্দে ছুটতে লাগল।

পাগল হঠাৎ ছোটা বন্ধ করলে। ওর কোঁচড়ের ভেতর থেকে একটা বান্‌রুটি বের করে ভোম্বলের হাতে দিয়ে বললে, 'নে, খেতে খেতে চল। একে বলে বান্‌রুটি। বেশ মিষ্টি মিষ্টি। চিবুলে খুব আরাম লাগবে।,

ভোম্বল বান্‌রুটি খেতে খেতে পাগলের সঙ্গে পথ চলতে লাগলো।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে ওরা ছুট্ লাগাল। তারপর দেখা গেল—ওরা একটা চা-বাগানের ভেতরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

পাগল বললে, 'চুপ, এইবার পা টিপে টিপে আয়। এগুলো হচ্ছে সায়েবদের কোয়ার্টার। আমরা যাবো এই চা-বাগানের ম্যানেজারের কোয়ার্টারে।

ভোম্বল কোনো উত্তর দিলে না। চুপচাপ পা টিপে টিপে ওর সঙ্গে এগুতে লাগল।

হঠাৎ পাগল থমকে দাঁড়াল!

ভোম্বলকে টেনে নিয়ে পাগল একটা ঝা প্‌ড়া গাছের তলায় গিয়ে হাজির হল।

সেখানে অনেকটা অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। পাগল তার কোমর থেকে কি একটা ভারী জিনিস বের করলে—ন্যাকড়া দিয়ে জড়ান।

ফিস্‌-ফিস্‌ করে ওর কানের কাছে বললে, 'খুব হুঁসিয়ার। এর ভেতর তেলাকুচ আছে। ঐ যে ম্যানেজারের বাংলো দেখা যাচ্ছে। তোকে ঐ বাংলোর পেছনকার ছোট দবজায় গিয়ে টক্‌ টক্‌ শব্দ করতে হবে। আস্তে দরজাটা খুলে যাবে। একটা লোক বেরিয়ে আসবে। তার হাতে এই তেলাকুচটা তুলে দিতে হবে। তারপর সে যা বলবে, 'বাধ্য ছেলের মত তাই করবি, বুঝলি ? আমি এখন পালাই।

পর মুহূর্তেই পাগলটা তার হাত ছেড়ে দিয়ে মিশকালো আঁধার রাতে কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভোম্বল ভাবলে সেই রাতে শুধু কি তার অবাক হবার পালা ?

সে এক মুহূর্ত বোকার মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো সেই পাগলের আর চিহ্ন মাত্র নেই !

পাগল যে ছোট দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেই দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেলে—ছোট্ট এক টুকরো আলো যেন দরজার ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে উঁকি দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে ভোম্বল সেই দিকে এগিয়ে গেল !

হঠাৎ যেই নিশুতি রাতে কুকুরের ডকে শোনা গেল। কী সর্বনাশ !

সাহেরের কুকুর ! কোন রকমে ছাড়া পেয়ে যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তবে আর উপায় নেই !

ভোম্বল সেই অাঁধারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘামতে লাগল।

মনে হল কে যেন গিয়ে কুকুরটাকে শান্ত করলো। কুকুরের ডাক বন্ধ হয়ে গেল।

ভোম্বল ভাবলে, এখন সে কী করবে ?

পাগলের কথামতো এখন তাকে গিয়ে ওই ছোট্ট দরজাটায় টক্‌-টক্‌ শব্দ করতে হবে।

কিন্তু কোনো মানুষ না বেরিয়ে যদি ওই ডাকাতে কুকুরটাএসে তাকে আক্রমণ করে তা'হলে প্রাণ নিয়ে পালাবার অবসরটুকুও পাওয়া যাবে না।

যা হবার হবে, সে আর এমন করে ভাবতে আর ঘামতে পারে না।

ওর কেবিল মনে হতে লাগলো সে যেন আরব্য উপন্যাসের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর কোনো মানুষ হয়ে গেছে ! হঠাৎ যেন কোত্থেকে একটি খোজা প্রহরী বেরিয়ে আসবে। হাতে তার ঝক্‌ঝক্‌ করছে তলোয়ার। এক্ষুণি ধরে নিয়ে গিয়ে বাদশার কাছে হাজির করবে। বাদশার বিচারে কাল হবে তার প্রাণদণ্ড !

কিন্তু কাজ করতে এসে এভাবে ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকলে ত হবে না। খোজা প্রহরীই আসুক, আর যেই আসুক—তার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা সমাধা করতেই হবে।

ভোম্বল সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে পেছনকার দরজায় শব্দ করলো টক্—টক্—টক্।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। মৃদু দীপালোকে দেখা গেল—একটি মিশ্‌মিশে কালো হাত বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে টেনে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষীণ আলোটাও নিভে গেল। কার গলা থেকে শোনা গেল, চুপ! একটি কথাও নয়। আমার সঙ্গে পা টিপে টিপে চলে এসো।

কাঠের বাড়ি—কাঠের মেঝে। একটি অপরিচিত হাত ধরে ভোম্বল এগিয়ে চলল। তার মনে হল, সে যেন কোনো দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করছে। এই দৈত্য-পুরীর প্রতি কোণো যেন বিপদ আর বিস্ময় ওৎ পেতে বসে আছে, একটু সুযোগ পেলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে!

কিন্তু কিছু ভাববারই কি অবকাশ আছে? সেই দৈত্যের মতো মানুষটি ওর কানে কানে বললে, 'এসো আমার হাত ধরে। এই কোণের ঘরটায় তোমার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। কিন্তু সাবধান, ঘুমিয়ে পড় না যেন। আজই শেষ-রাত্তিরে তোমায় একটি অসুর নাশ করতে হবে।

ভোম্বল ঠিক বুঝতে পারে না—সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবলি বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ঢেউ যেন তাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে।

সেই সূচিভেদ্য আঁধার রাতে তাকে কোন্ নাটকে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে—সে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যে তার জন্য কি অজানা আতঙ্ক লুকিয়ে আছে—তাও সে ভালো করে জানে না। সেই অপরিচিত ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সে যদি নিজের পার্ট ভুলে যায় তা'হলে তার কি দশা হবে সেটাও সে কল্পনা করে নিতে পারে না!

ইতিমধ্যে সেই দৈত্যের মতো শক্ত হাতটা তাকে কোণের দিকের একটা নিরিবিলি ঘরে নিয়ে এল। বললে, 'এইখানেই তোমায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে হবে।

একটু থেমে লোকটা বললে, 'আজ ঘরে খাবার আর কিছু নেই। খানিকটা পুডিং আছে। তাই খেয়ে ফেল। তারপর তোমায় আমি এক গ্লাস গরম দুধ দিচ্ছি। এই দুধ খেয়ে আরাম পাবে।

লোকটা কথা বললে বটে, কিন্তু আলো জালবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

নীরবেই ভোম্বল তার খাওয়া শেষ করলে। ওর ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। পাগলটা একটা বান্‌রুটি খাইয়েছিল বটে, তবে তাতে কি ক্ষিদে যায়?

এইবার পুডিং আর দুধ খেয়ে ভোম্বল শান্ত হল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। একটা ছোট বিছানাও পাতা ছিল ঘরের এক কোণে।

ভোম্বল ভাবলে, এইখানে বাকী রাতটা সে দিব্যি ঘুমিয়ে নেবে। তারপর কপালে যা থাকে ঘটবে।

কিন্তু দৈতটা তাকে বিছানায় শুতে দিলে না। ওকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। তারপর নিজে একটা টুল এনে তার পাশে এসে বসে পড়লো।

কারো মুখে খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই। তারপর দৈত্যটাই কথা বলা সুরু করলে।

ধীরে ধীরে ওর কানের কাছে মুখ এনে সে যেন চাপা গলায় গল্প বলতে লাগলো।

চেহারাটা দৈত্যের মতো হলে কি হবে—মুখের কথা ভারী মিষ্টি।

দৈত্য বললে, 'বুঝতে পারছি, এখন ঘুমে তোমার চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু উপায় নেই। আর রাত্তিরে আমি তোমায় কিছুতেই ঘুমুতে দেবো না। বলেছি ত' আজ শেষ রাত্রেই একটা অসুর নাশ করতে হবে।

ভোম্বল কিছুই বুঝতে পারলো না। কে অসুর কাকে নাশ করতে হবে—সবই যেন তার হেঁয়ালী বলে মনে হল।

সে বসে বসে ঢুলতে লাগলো। পরিবেশটি ঘুমের পক্ষে ভারী মনোরম।

কোণের ঘরটি নীরব। মিশকালো আঁধার রাত। জানালা দিয়ে অগুন্তি তারা দেখা যাচ্ছে। এই ত' ঘুমিয়ে ঘুমিরে স্বপ্ন দেখার রাত।

কিন্তু দৈত্য তাকে ঘুমুতে দেবে না। রাতটি তার অবাক হবার রাত।

এই ত' খানিকক্ষণ আগে এক পাগলা এসে তাকে খুব খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ করালে। এইবার দৈত্যের পাল্লায় পড়ে ঘুমের দফা শেষ।

দৈত্য আবার ওকে ঝঁকুনি দিয়ে সচেতন করে দিলে। বললে, 'মনে করো, আমরা একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। যে কোন মুহূর্তে রাশি রাশি গরম লাভা বেরিয়ে এসে আমাদের ভস্ম করে দিতে পারে। এই মৃত্যুর মুখোমুখি বসে ঘুম কি সত্যি আসে ?

দৈত্য খানিকটা চুপ করে রইলো।

ততক্ষণে ভোম্বলের চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গিয়েছে। দৈত্য বললে, 'তা'হলে আসল কথাটাই জেনে রাখো। অত্যাচরী পুলিশ কর্মচারী সারা জীবন ধরে বিপ্লবী ছেলে-মেয়েদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। আঙুলে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়েছে দেহে, ঘন্টার পর ঘন্টা বরফ-জলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে—আরো যে কত অত্যাচার করেছে তার লেখাজোখা নেই। সেই সাহেব পুলিশটা এখন প্রাণের ভয়ে চা-বাগানের ম্যানেজার হয়ে লুকিয়ে আছে। তবু বিপ্লবীদের হাতে তার নিস্তার নেই। আমি ওর বিশ্বস্ত ভৃত্য সেজে ওকে আগলে রেখেছি। আজ তোমার হাতে ওর মৃত্যু।'

চমকে উঠলো ভোম্বল ; বললে, 'আমার হাতে ?'

—হ্যাঁ, তোমার হাতে। আজ শেষ রাত্তিরে কাজ হাসিল করতে হবে। সাহেবটা মাতাল হয়ে আজ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আজই ত' অসুর নিধনের উপযুক্ত লগ্ন। তোমার আনা ওই তেলাকুচ দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে। তারপর তোমায় শেষ-রাত্তিরেই পাঠিয়ে দেবো দূরে নিরাপদ অঞ্চলে। আর আমি! বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো মৃতদেহ আগলে চোখের জল ফেলতে থাকবো। নইলে বিপ্লবী দলকে সন্দেহ করবে যে!

মনে হল, আঁধারের ভেতর দৈত্যটার সাদা দাঁতগুলো ঝিক্‌মিক করে উঠলো।

॥ আট ॥

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে—ঠিক ক'টা বেজেছে জানতেও পারে নি ওরা।

হঠাৎ ঢং-ঢং করে দুটো বাজতেই ওরা দুটি প্রাণী নড়ে-চড়ে বসলো—যেন ঘুম ভাঙলো ওদের। এরই মধ্যে এত রাত হয়ে গেছে—এতটুকু টের পায় নি ওরা!

এইবার দৈত্যটা আঁধারের মাঝখান থেকে বললে, 'হুঁ! হুঁ! এখন আমাদের সন্ধি-পূজোর সময় হলো। ঢ্যাং কুড়-কুড় করে ঢাক বাজছে না বটে, তবে লগ্ন হয়েছে। ওরে পুঁচকে ছোঁড়া, তোকে এইবার তৈরী হতে হবে।'

দৈত্যটার কথার নমুনা দেখে মনে হলো—ওর যেন আনন্দ হয়েছে খুব। তাই একেবারে 'তুমি' থেকে 'তুই'তে এসে হাঁকডাক সুরু হয়েছে।

আর আনন্দ হবেই বা না কেন ?

জেলে যেমন কৈ মাছ জিয়িয়ে রাখে, কিংবা মিঞা সাহেব যেমন মুরগীকে খাইয়ে-দাইয়ে বড়-সড় করে তোলে, তারপর একদিন নিজে ছুরি বসিয়ে দেয়—এও যেন অনেকটা সেই মজার খেলা।

সাহেব ম্যানেজারকে দৈত্যটা অনেকদিন ধরে ভালো-মন্দ খাইয়েছে, প্রচুর সেবা-যত্ন করেছে, আর আজ তাকেই শেষ করবার শুভদিন এসেছে।

কার মৃত্যু-বাণ যে কোথায় লুকানো থাকে—ক'জনেই বা তার হদিস রাখে ?

মন্দোদরী জানতো রাবণের মৃত্যু-বাণ কোথায় লুকানো আছে, কিন্তু কোন্ দস্যি এসে সেই মৃত্যু-বাণ বের করে নেবে সে-কথা লঙ্কার মহারাণীর জানা ছিল না!

এই দুর্দান্ত মাতাল সাহেবটা কি জানে—তার মৃত্যু-বাণ নিয়ে কোন্ কাল-রাত্রে কোন্ অচেনা বিদেশী এসে এখানে হাজির হবে ?

ভোম্বল এতক্ষণে সমস্ত ভয়-ডরের কাঁপুনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এখন সে সত্যি মনস্থির করেছে। অসুরটাকে যখন নিধন করতে হবে, তখন মিছিমিছি ভয়ে আর আশঙ্কায় দুলে লাভ কি ?

হৃদয়কে পাষাণের মতো শক্ত করতে হবে। এখানে দয়া-মায়ার কোন স্থান নেই।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' দায়িত্ব যখন এসে সামনে হাজির হয়, তখন যতই কষ্ট হোক না কেন—সেই দায়িত্ব পালন করতেই হবে। ভোম্বল তাই নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। তাই দৈত্যটাকে জিজ্ঞেস করলে—কি করতে হবে আমায় বলো এইবার।

দৈত্যটারও যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো ; বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

কয়েকটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে—বাংলোর এক কোণে একটা বড় ঘর। মৃদু আলো জ্বলছে সেই ঘরে। এইটেই সাহেব ম্যানেজারের নিজের ঘর।

সাহেবটা অনেক রাত্তির অবধি আপন খেয়ালে ঢোলে আর ঢুকু ঢুকু মদ খায়। এতক্ষণ বোধ হয় মদের নেশায় নেতিয়ে পড়েছে।

দৈত্যটা আস্তে আস্তে সাহেবের ঘরের দরজাটা ফাঁক করে ধরলো।

ভোম্বল উঁকি মেরে ভেতরে তাকিয়ে দেখলে। সাহেবের মাথাটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। হাতের গেলাস থেকে খানিকটা মদ নীচে পড়ে গেছে। হয়ত মেঝের কার্পেটের খানিকটা অংশ ভিজে গেছে—সেদিকে সাহেবের ভ্রূক্ষেপ অবধি নেই।

দৈত্যটা ভোম্বলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'এই উপযুক্ত অবসর। তোমার কাজ হাসিল করে ফেল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

ভোম্বল মাতাল সাহেবটার দিকে তাকালো।

এই সাহেবটাই কত বিপ্লবী ছেলেমেয়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে—হাতের আঙুলে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে, ইলেকৃট্রিক শক্ লাগিয়েছে, শীতের রাত্রে বরফ-জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, সারারাত ঘুমুতে দেয় নি, ওঠ-বোস করিয়েছে। আজ প্রাণের ভয়ে সাহেবটা এসে চা-বাগানে লুকিয়ে রয়েছে!

দেখে ভোম্বলের অন্তর ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো। লোকটা মানুষ না পশু ?

কিন্তু এই অসহায় মানুষটাকে মেরে কি বীরত্ব দেখাবে ভোম্বল ? এই মাতাল সাহেবটা ত' মরেই আছে। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা অবধি ওর নেই।

ওকে যদি জাগানো যায়—ওর মুখের সামনে ওর অপকর্মের কথা একে একে বলা

যায়, তারপর জানিয়ে দেওয়া যায় যে, এই সব নীচ কাজের জন্যই আজ তোমায় চরম-দণ্ড দেওয়া হচ্ছে—তা'হলেই সত্যিকারের বিপ্লবীর কাজ হবে। ভোম্বল আপন মনে সেই কথাই ভাবছিল।

তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে দৈত্যটা বললে, 'এ কি ছোক্‌রা, সাহেবকে দেখে তোমার ভাবান্তর হল কেন? গৌর-নিতাইয়ের ভাব মনে জাগলো নাকি?

'মেরেছ কলসীর কানা—
তাই বলে কি প্রেম দেবো না?'

ওসব ভাব মনে জাগলে কিন্তু কাজ হাসিল করতে পারবে না। চট্‌পট্‌ কাজ করে সরে পড়তে হবে। জানাজানি হয়ে গেলে তোমারও বিপদ, আমারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

তবু ভোম্বলের মন সায় দেয় না। একটু আপত্তি করে বললে, 'আচ্ছা দৈত্যভাই, এই মরা মানুষটাকে মেরে হাত কালি করবো?

হঠাৎ মাতাল সাহেবটার দেহ নড়ে উঠলো—ওই ত' সাহেব মাথা তুলেছে।

মাতাল সাহেবটা জড়ানো গলায় বললে, 'এই ইডিয়েট···আমি মরা?···হা-হা-হা! আরো সাত বোতল এখনো খেতে পারি। নিয়ে আয় দেখি কত আনতে পারিস্‌।

মাতাল সাহেবটার কথা শুনে ভোম্বলের ভারী কৌতুক বোধ হল। শিয়রে যার শমন দাঁড়িয়ে, সে তখনও আস্ফালন করছে!

এমনিই হয়। মানুষের দাম্ভিকতার বুঝি সীমা নেই।

মানুষ যে কত অসহায়—তা বুঝিয়ে দিলেও সে ভালো করে বুঝতে পারে না।

দৈত্যটা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠলো; বললে, 'আরে পুঁচকে ছোঁড়া, তুই করছিস্‌ কি? সাহেবটার জ্ঞান যে ফিরে এসেছে। ও মাতাল হলে কি হবে—আসলে মানুষটা ভারী দুর্দ্দান্ত। এক্ষুণি কাজ হাসিল করে ফেল্‌—নইলে তুই বিষম বিপদে পড়ে যাবি।

ততক্ষণে সাহেবটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। জড়ানো স্বরে বললে, 'ওরে ইডিয়েট, তুই এসেছিস্‌, আমায় খুন করতে? হা-হা-হা! আমার নাম ডঙ্কিহেড! আমি তোর মতো পুঁচকে শয়তানকে ভয় করি নাকি?

ভোম্বল এইবার নিজের মধ্যে যেন একটা বল ফিরে পেলে।

সে মাথা উঁচু করে জবাব দিলে—হ্যাঁ, শয়তান সাহেব! তোমায় আমি খুন করতে এসেছি। অসহায় পেয়ে তুমি আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করেছ। কিন্তু দেশকে ভালোবাসা ছাড়া তাদের আর কোনো অপরাধ ছিল না। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে এসে তোমরা শুধু টাকা লুটেছ, আর এই দেশের সর্বনাশ করেছ! আজ সুদশুদ্ধু সব শোধ করে দিতে হবে! তুমি প্রস্তুত হও সাহেব!

হা-হা করে হেসে উঠে সাহেবটা বললে, 'আরে ক্ষুদে শয়তান ! তুই আমাকে প্রস্তুত হতে বলছিস্ ? তুই কি মিলিটারী ম্যান নাকি ? এই যে আমার জবাব !'

এই বলে মুহূর্ত মধ্যে একটা কাচের গ্লাস তুলে নিয়ে মাতাল সাহেবটা ভোম্বলের দিকে ছুঁড়ে মারলে। গ্লাসটা ভোম্বলের কপালে লাগতেই ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগলো।

দৈত্যটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। এইবার সে এগিয়ে এসে ভোম্বলকে বললে, 'তুই করছিস্ কি পুঁচকে ছোড়া ? তোকে এখানে বক্তৃতা দিতে কে ডেকেছে ? তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে ফেল, তারপর পালিয়ে যা ! নইলে আমাদের দু'জনেরই মৃত্যু !

টলতে টলতে সাহেবটা বললে, 'হুঁ ! এতক্ষণে বুঝতে পারছি—আমার চাকরটাই তোকে ডেকে এনেছে। আজ তোদের দুজনকেই আমি মেরে ফেলবো।'

এই বলে মাতাল সাহেবটা যেই আর একটা কাচের বোতল হাতে তুলে নিয়েছে অমনি ভোম্বলের হাতের সেই অব্যর্থ 'তেলাকুচ' তার আগুনের নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিলে।

সেই নিশীথ রাতে মাতাল সাহেবটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

ভোম্বল বললে, 'আমার কাজ ত' হাসিল ! এইবার কি করতে হবে বলো !

দৈত্যটা তাড়াতাড়ি ভোম্বলকে ধরে একটা জানালার কাছে নিয়ে গেল। দূরে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ওদিকে কি দেখছ ?'

ভোম্বল চোখদুটো কচলে নিয়ে জবাব দিলে—দূরে একটা লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে।

দৈত্যটা বললে, 'ঠিক দেখছিস্। এক্ষুণি ওইখানে ছুটে যা। ওখানে একটি লোক তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর সে যা বলে তাই করবি।

ভোম্বল হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে—কিন্তু ভাই, তোমার গতি কি হবে ? একটু বাদেই লোকজনে ভরে যাবে এই ম্যানেজারের বাংলো। তখন তোমায় কে বাঁচাবে তাদের হাত থেকে ?

দৈত্যটা মৃদু হেসে উত্তর দিলে—আমার জন্য কোনো ভয় নেই রে ! আমি বিপ্লবী। কিন্তু আজ আমি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করবো। পাঁচ বছর আমি এই মাতাল সাহেবকে আগলে আছি ! সবাই জানে প্রাণ দিয়েও আমি সাহেবের সব কাজ করি। আমায় কেউ সন্দেহ করবে না। লোকে ভাববে অন্য কেউ এসে সাহেবকে মেরে রেখে গেছে। জানিস্, 'ছেলেবেলা থেকে আমি খুব ভালো অভিনয় করতে পারি। আজ চাকরের পার্ট পেয়ে এমন মরাকান্না সুরু করবো যে

সবাই দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আর দেরী নয়। তুই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যা এখান থেকে।'

এই বলে এক ধাক্কা মেরে দৈত্যটা ভোম্বলকে বাংলোর বের করে দিলে। তারপর সাহেবের মৃতদেহের পাশে বসে মরাকান্না সুরু করে দিলে।

ওদিকে ভোম্বল সেই লাল আলোটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে।

চা-বাগানের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে একটি জীপ। আর ভেতরে বসে আছে এক শিখ ড্রাইভার। ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, 'শীগ্গীর গাড়ীর ভেতর উঠে বোসো। আর সময় নেই!

হঠাৎ ড্রাইভারটা তার মুখের দিকে একটা টর্চের আলো ফেললে, তারপর আঁতকে উঠে বললে, 'এ কি! তোমার কপালটা যে একেবারে কেটে গেছে! মাতাল সাহেবটা মেরেছে বুঝি?'

ভোম্বল উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, সাহেবটা একটা কাচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল! তাতেই কপালটা কেটে গেছে।'

শিখ ড্রাইভার বললে, 'তোমার কোনো ভয় নেই, আমার গাড়ীতে ফার্ষ্ট-এইড্ বক্স আছে।'

এই কথা বলেই শিখ ড্রাইভার দ্রুতবেগে জীপ গাড়ীটা চালিয়ে দিলে।

চা-বাগান পেছনদিককার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।

শিখ ড্রাইভারের নিপুণ হাতে জীপ গাড়ীটা যেন উড়ে চলল।

আরো খানিকক্ষণ বাদে, একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে গাড়ীটা থামল।

শিখ ড্রাইভার পায়ের কাছ থেকে ফার্ষ্ট-এইড্ বক্স খুঁজে বের করল।

তার ভেতর সব কিছু সাজানো রয়েছে 'তুলো, টিঞ্চার আয়োডিন, নানা রকম ওষুধ, কাঁচি, ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জড়ানো ন্যাকড়া, সব কিছু।

অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিখ ড্রাইভার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে ভোম্বলের মাথায়।

ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ড্রাইভার একটুখানি হেসে বললে, 'বিপ্লবীকে সব রকম কাজই শিখে রাখতে হয়।'

আবার গর্জ্জে উঠলো জীপ গাড়ীর ইঞ্জিন। সেই নির্জ্জন নিশীথ রাত্রে সেই গাড়ী যে কোন্ পথে উল্কার বেগে ছুটে চলল, 'ভোম্বল তা কিছুই ঠাহর করতে পারলে না। নির্জ্জীবের মতো সে গাড়ীর ভেতর শুয়ে পড়ল।

॥ নয় ॥

ভোম্বলের মগজের ভেতর এলোমেলো কথার টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছিল !

সত্যি, স্রোতের শ্যাওলার মতো সে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কোথায়ও তার নীড় বাঁধবার উপায় নেই। এই যে সাহেবটাকে সে এই মুহূর্তে 'তেলাকুচ' দিয়ে খতম করে দিয়ে এলো, 'সে যে কত অপকর্ম করেছিল তার সীমা-সংখ্যা নেই !'

যে সব বিপ্লবী ভাই-বোন ওর হাতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তাদের আত্মা আজ শান্তি লাভ করবে। এই কথা ভেবে ভোম্বল নিঃশ্বাস ফেললে।

হয়ত মগজের ভেতর নানা কথার জালে সে জড়িয়ে পড়েছিল। আল্‌তো ভাবে ঘুমের পরশ তাকে শেষরাত্তিরের আরাম দিচ্ছিল। গাড়ীর দোলানিতে সেই ঘুমটা আরো গাঢ় হতে চলেছিল।

এমন সময় আর এক বিপত্তি। সেই আঁধারের ভেতর থেকে একটা গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল—'হলট্' (Halt)।

শিখ ড্রাইভার আচম্‌কা ব্রেক কসতে জীপটা যেন একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

এই অন্ধকারের ভেতর কে আবার পথের মাঝখানে তাদের গাড়ী থামায় ? পুলিশের লোক নয় ত ?

অজান্তেই ভোম্বলের বুকটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু তার সামনেই বসে রয়েছে জবরদস্ত শিখ ড্রাইভার। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা সেই করবে। কেননা, 'সেই ত' এখানকার স্থানীয় লোক। ভোম্বল ত' শুধু অন্ধের মত গাড়ী চেপে চলেছে।

রাস্তা আটকে যারা দাঁড়িয়েছিল—গাড়ীর আলোতে দেখা গেল, তাদের প্রত্যেকের হাতে উঁচিয়ে রাখা রিভলবার।

কি বিপদ ?

এবার কি ভোম্বলদেরই ধরা পড়ার পালা ?

পুলিশে ধরা মানেই ত' ফাঁসি ! পেছনে রয়েছে সাহেবকে গুলী করে হত্যা করার কাহিনী !

ভোম্বল জীপের পেছনদিককার সিটে বসে কেঁপে উঠল।

কিন্তু ব্যাপারটা ত' মোটেই তা নয়! শিখ ড্রাইভার যে হো-হো করে হেসে উঠল ; তারপরই চীৎকার করে উঠল, 'তেলাকুচ'।

পথে দাঁড়ানো রিভলবার-ধরা লোকগুলোও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, 'তেলাকুচ'।

তবে কি ওরাও বিপ্লবী দলের লোক আর 'তেলাকুচ' ওদের কোড ওয়ার্ড ?

পথে দাঁড়ানো লোকগুলোও তখন হাসতে সুরু করে দিয়েছে। ওর মধ্যে একজন একটু এগিয়ে এসে একটা ভারী ব্যাগ জীপের ভেতর ফেলে দিলে।

শব্দ শুনে মনে হলো, 'তার ভেতর অনেক টাকাকড়ি আর গয়নাগাটি রয়েছে।

শিখ ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, 'তা'হলে বৌনিটা তোমাদের ভালোই হয়েছে ?

দলের যে নেতা সে ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসেছে।

ভালভাবে গুছিয়ে বসতে বসতে সে জবাব দিলে—হ্যাঁ,যা আশা করে গিয়েছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশী পাওয়া গেছে। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার! বৌ-ঝি আর গিন্নীবান্নিরা সবাই গয়নাগাটিতে ইন্দ্রাণী সেজেই ছিলেন। তেলাকুচের ভয় দেখিয়ে সব সংগ্রহ করতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কী ?

—হুঁ হুঁ! বাড়ীর কর্তার সিন্ধুকে বহু নগদ টাকা আর গিনি জমা করা ছিল।

—তা'হলে তোরা সবাই আজ শেয়াল বাঁ-হাতি করে বেরিয়েছিলি বল ?

ভোম্বলের ততক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে! বুঝলে এরা সবাই পরস্পরের পরিচিত বিপ্লবী।

বিপদের কালো মেঘ তা'হলে সত্যি কেটে গেছে। এরই মধ্যে একটা টর্চের আলো ওর মুখের ওপর এসে পড়েছে।

দলের নেতা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে, 'একে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে ?'

শিখ ড্রাইভার হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—ও হচ্ছে আজকের রাতের 'হিরো'। ডঙ্কিহেডকে এইমাত্র খতম করে আসছে!

এই সুখবর শুনে দলের নেতা ভোম্বলকে জড়িয়ে ধরলে।

ততক্ষণে অন্যান্য বিপ্লবীরাও জীপের ভেতর উঠে এসেছে।

'যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দশজন।' কোনো অসুবিধাই হল না ওদের।

গাড়ীভর্ত্তি মানুষ নিয়ে জীপ আবার যেন উড়ে চলল।

আরো কিছুদূর চলবার পর দলের নেতা বললে, 'বুঝলে ভাই সারথি, আমাদের আজকের রাত্তিরের 'অপারেশন' খুব ভালোভাবে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা মারাত্মক গলদ রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

সারথি শিখ ড্রাইভার চমকে উঠলো। ব্যাকুলকণ্ঠে শুধালো—মারাত্মক গলদ ?

ব্যাপারটা কি বল ত’ ? আমি ত’ কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো চিহ্ন-টিহ্ন রেখে এসেছ নাকি ?

দলের নেতা মাথা নেড়ে জবাব দিলে—উঁহু! তার চাইতেও গুরুতর। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট ছেলে ছিল। তার নাম শোভন। দিব্যি ফুটফুটে ছেলে। কাজে-কর্মেও ছিল ওস্তাদ। সেই শোভনকেই আমরা রেখে গেলাম !

—রেখে এলে !···সারথি আঁতকে উঠল—কি হয়েছিল তার ?

দলের নেতা গলাটা একটু নীচু করে বললে, ‘কোথা থেকে —কি করে যে একটা চোট লাগল ওর মাথায়। ছেলেটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল !

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? ফোটা ফুলটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, আর আসবার সময় তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।

সারথি মাথা নাড়লে ; বললে, ‘তাই ত’ ! সত্যি বড় দুঃখের কথা।’

দলের নেতা ভয়ে ভয়ে বললে, ‘কিন্তু আসল বিপদ ত আমাদের সামনে।,

সারথি জিজ্ঞেস করলে, ‘আসল বিপদ ? সেটা আবার কি ?’

দলের নেতা জবাব দিলে, ‘তা’হলে তোমায় বলি শোনো। আমরা ওই শোভনের বাড়িতেই আস্তানা গেড়েছি। ওর তিন কুলে কেউ নেই। আছে এক বুড়ী মা। নির্জ্জন পোড়ো বাড়ি, তাই সেইখানে আমাদের লুকিয়ে থাকবার ভারী সুবিধে। এই শোভন ছেলেটি বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। বেশ চালাক-চতুর, চট্‌পটে ছেলে। আমার ওকে দিয়ে এমন সব কাজ উদ্ধার করেছি। যে কাজ কেউ পারে না শাভন গিয়েহাসিল করে আসে। এই শোভন ছেলেটিই আমাদের লুকিয়ে রেখেছে ওদের বাড়িতে। ওর মা বুড়ী হলে কি হবে, আমাদের সবাইকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়। সকলকে ছেলের মতো দেখে। আজ কোন্ মুখ নিয়ে আমি ওই বুড়ী মার সামনে গিয়ে হাজির হবো ?

শিখ সারথি মাথা নাড়তে লাগলো—সত্যি, ভাবনার কথাই হল।

দলের নেতার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে বললে—তুমিই ভেবে দেখ সারথি, বুড়ী মা আকুল আগ্রহে তার ঘরের দাওয়ায় একবার উঠছে, একবার বসছে আর একবার বাড়ির ভেতর গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করছে। আমরা গিয়ে সেখানে হাজির হলাম। বুড়ী মা ছুটে বেরিয়ে এলো তার একমাত্র ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। যখন সেই মা একে একে সবাইকে দেখতে পাবে, কিন্তু তার ছেলেকে আমাদের মধ্যে খুঁজে পাবে না, তখন আমি সেই ব্যাকুলা মাকে কী সান্ত্বনা দেবো —তুমি বলো দেখি ভাই সারথি ? লজ্জায় আমার মাথা মাটিতে নুইয়ে পড়ছে। আমি চোখে আঁধার দেখছি। আমার কি মনে হচ্ছে জানো সারথি ?

—কি ?

—মনে হচ্ছে শোভনদের বাড়িতে আমি যেন আর না ঢুকি। সেই ব্যাকুলা মায়ের চোখের সামনে আমি যেন আর না দাঁড়াই! ছুটে চলে যাই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে! কিন্তু বিপ্লবী তার মায়ের সামনে কর্তব্য থেকে এক চুল সরে দাঁড়াবে না। আমাকে সেই মায়ের সামনে গিয়ে হাজির হতেই হবে। তারপর যে অভিশাপ তিনি দেন, আমায় মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে।

সারথি তার বাঁ হাত দিয়ে দলের নেতার হাতে একটা চাপ দিয়ে বললে, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ।'

কথা চলছে জীপের ভেতর আর সেই জীপ উল্কার বেগে অন্ধকার পথে এগিয়ে চলেছে।

দলের নেতার কথা শুনে অন্যান্য সবাইও চুপচাপ বসে আছে। তাদের মুখেও কোন কথা নেই।

ভোম্বলের মুখেও কে যেন বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ ধরে সে যেন উপন্যাসের কাহিনী শুনছিল। আজকের রাতটা কি আরব্য উপন্যাসের এক হাজার রাত্রির একটি চিহ্নিত রাত ?

সেই দোকানের সামনে দাঁড়ানো থেকে সুরু করে সব ছবি তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

সেই অন্ধকারে সাহেবের বাংলোর ভেতর দৈত্যটার কাণ্ডকারখানা। ডঙ্কিহেড সাহেবের মাতলামীর ব্যাপারটাও তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। লোকটা এমনিতেই ত' দারুণ শয়তান, তার ওপর মদ খেয়ে তার মুখের চেহারা হয়েছি আরো বিশ্রী। লোকটার ওপর কোনো অনুকম্পা কিংবা দয়ার কথা জাগে না—শুধু ঘৃণাই সারা মনটাকে ছেয়ে ফেলে।

তারপর কি ভাবে দৈত্যটার প্ররোচনায় সে ঐ মাতাল সাহেবটাকে খুন করে পালিয়ে এলো এই শিখ সারথির জীপে!

উল্কা-বেগে ছুটে চললো জীপ ; কিন্তু সেইখানেই কি কৌতূহলের শেষ আছে ?

রিভলভারধারী একদল লোক মাঝপথে এসে হাজির হলো···লোকগুলো তাদের রাস্তা আগলে দাঁড়ালো শেষকালে দেখা গেল—ওরা তাদের সহকর্মী আর একদল বিপ্লবী—নিজেদের কাজ সমাধা করে রাতের অন্ধকারে ফিরে আসছে!

দুই দলের মিলন হল মাঝপথে। রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার ওদের মনে প্রীতির রাখী পরিয়ে দিল।

এখানে আবার ভোম্বল শ্রোতা। উপন্যাসের চাইতে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনলো—ওদের দলের নেতার কাছে।

ভোম্বল এখানে আর কাহিনীর নায়ক নয়। সে শুনে চলেছে এক নতুন আখ্যায়িকা—যে কাহিনীর সঙ্গে তার নিজের কোনো যোগাযোগ নেই।

এখন আবার তাকে শিখ সারথির সঙ্গে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে ভোম্বল কিছুই জানে না।

চুপচাপ বসে রইলো ভোম্বল। তখন পর্য্যন্ত কোনো কথাই বলে নি সে।

হঠাৎ শিখ সারথি বলে উঠলো—আমরা কিন্তু প্রায় এসে পড়েছি।

এই কথা শুনে সবাই সচকিত হল; গাড়ীর ভেতর একটু নড়ে-চড়ে বসলো।

পায়ের কাছে যে বিরাট থলেটা রাখা ছিল—দলের নেতা সেটা ভালো করে টিপে দেখলো। তারপর বললে—হ্যাঁ, এই দিকটা তা ঠিকই আছে। কিন্তু যা আমরা হারিয়ে এলাম, তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

তখনো পূর্বাকাশ লাল হয়ে ওঠে-নি। জীপ গিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো।

সেই জঙ্গলের ভেতর একটি জীর্ণ বাড়ি। দেখেই মনে হয় অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি। চূণ-বালি খসে পড়েছে—মাঝে মাঝে ইটগুলো দাঁত বের করে রয়েছে!

পূব দিকের আকাশ আরো লাল হয়ে উঠলো। সবাই তাকিয়ে দেখলে, বাড়ির সামনেকার বারান্দায় একটি মূর্তি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দলের নেতা চুপি চুপি শিখ সারথির কানে কানে বললে—ওই যে বুড়ী মা দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা বলো ত' আমি কি করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো?

শিখ সারথি চুপি চুপি উত্তর দিলে—সত্যি ভয়ের কথা। এর চাইতে সম্মুখ-যুদ্ধে গুলী খেয়ে মরা ভালো।

বুড়ী মা এর মধ্যে নীচে নেমে এসেছে। তার দুই চোখের দৃষ্টি-প্রদীপ সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে—সেই চেনা মুখটি কোথায়?

বুড়ী মা দলের নেতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো; বললে—আমার শোভন কোথায়—শোভন? তাকে বুঝি তুমি আবার অন্য কাজে পাঠিয়েছ? কিন্তু তোমাদের সবাইকার যে ক্ষিদে পেয়েছে। শোভনেরও ক্ষিদে পেয়েছে। কখন সে ফিরে আসবে?

দলের নেতার মুখে আর কোনো কথা নেই। সেও যেন ক্ষণকালের জন্য পাথর হয়ে গেছে।

বুড়ী মা আরো এগিয়ে এলো ওর কাছে। ওর হাত দুটি ধরে বললে—আমি যে সারারাত জেগে তোমাদের জন্য ধবলীর দুধের পায়েস রান্না করে রেখেছি। আমি ভাবছি—তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার সামনে বসিয়ে খেতে দেবো।

তবু দলের নেতাদর মুখে কোনো উত্তর আসে না।

মা তখন আকুপাকু করে উঠলো।

কাতর-ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে বলে—তোমরা তাকে কোথায় রেখে এলে? সে যে আমার ভাঙা ঘরের হারানো মাণিক। সে তোমাদের সবাইকার সঙ্গে ফিরে এলো না কেন? বাছা আমার সারারাত কিচ্ছু খায় নি। যাবার সময় ডেকে বললাম, শোভন, খেয়ে যা; ও জবাব দিলে, ফিরে এসে খাবো মা! কোথায় সে? আমি তাকে কাছে বসে খাওয়াবো।

শিখ সারথি এই মর্মান্তিক দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছিল না; তাড়াতাড়ি এককোণে-দাঁড়িয়ে-থাকা ভোম্বলকে টেনে এনে মায়ের কাছে ঠেলে দিয়ে বললে—এই তোমার শোভন—একে তুমি কাছে টেনে নাও।

বুড়ী মা উন্মাদিনীর মতো দুই হাতে ভোম্বলকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলে।

তার দুই চোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে!

॥ দশ ॥

বুড়ী মার স্নেহের বন্যায় ভোম্বল যেন ভেসে যায়। জীবনের শেষ সম্বল শোভনকে হারিয়ে বুড়ী মা যেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ভোম্বলকেই শোভনরূপে কল্পনা করে নিয়েছে। তাই ডাকে ওকে 'শোভন' নামে—এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে চায় না।

শোভন কি কি খেতে ভালবাসতো—বুড়ি মা রোজ ভাগ ভাগ করে তাই রান্না করবে, পাতের কাছে সাজিয়ে দেবে কলাপাতায় করে—আর ভোম্বলকে সেই সব রান্না অনেকক্ষণ ধরে বসে খেতে হবে।

বুড়ী মা ফোক্‌লা দাঁতে হাসতে হাসতে বলে—শোভন, তুই ছেলেবেলা থেকে সবুজ রঙের কচি কলাপাতায় খেতে ভারী ভালোবাসিস্‌। আরো যখন ছোট ছিলি তখন বলতিস্‌, কচি কলাপাতায় ভাত খেলে মনে হয় যেন নেমন্তন্ন খাচ্ছি। সেই থেকে আমি তোকে সব সময় কচি কলাপাতায় ভাত দি। বাড়ির পেছন দিকে কত কলাগাছ লাগিয়েছি, দেখছিস্‌ ত-? সব তোরই জন্য। কলা পাকলে কলা খাবি, আর কলাপাতায় ভাত মেখে রোজ বড় বড় গরাসে ভাত মুখে তুলবি।

ভোম্বল এই সব কথা শোনে, আর তার দুই চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু বুড়ী

মার মনে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারে না। তাই বুড়ী মার এই স্নেহের অত্যাচার সে মুখ বুঁজে সহ্য করে। বুড়ী মা যখন যা বলে সে বাধ্য ছেলের মতো তাই শুনে যায়।

একদিন বুড়ী মা সকালে উঠেই হাঁকডাক সুরু করে দিলে—ওরে শোভন, আজ তোকে একবার জঙ্গলের দিকে যেতে হবে।

—জঙ্গলের দিকে? কেন মা?

—আমি ত' ভুলেই গিয়েছিলাম। তুইও ত' একবার মনে করিয়ে দিতে পারিস্।

—কি মনে করিয়ে দেবো মা?

—বাঃ রে! তুই যে ঢেঁকিশাক খেতে ভালোবাসিস্! একবারও ত' আমায় সে-কথা মনে করিয়ে দিস্ না। আমিই না হয় বুড়ো হয়ে গেছি; কিন্তু তোর ত' মাঝে মাঝে আবদার করে সে কথা বলা দরকার। কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল,—তুই ঢেঁকিশাক খেতে কত ভালোবাসিস্!

ভোম্বলের মনে পড়ে গেল, সেও ছেলেবেলা জঙ্গলে গিয়ে ঢেঁকিশাক তুলে এনেছে। ঢেঁকিশাকভাজা খেতে সত্যি ভালো লাগে। কত দিন দল বেঁধে গাঁয়ের কিনারে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে এই শাক ও যোগাড় করেছে। বুড়ী মার ছেলে শোভনও ঢেঁকিশাক খেতে ভালোবাসতো। ছেলে-ছোকরাদের পছন্দও বুঝি একই রকম হয়।

মনে মনে হাসলো ভোম্বল। কিন্তু বুড়ী মা না-ছোড়াবান্দা। বললে, 'টাট্কা, ঢেঁকিশাক তুলে নিয়ে আয়। আমি কবে আছি, কবে নেই! তুই যা-যা ভালেবাসিস্—সব আমি রান্না করে তোকে খাইয়ে যাবো।

বুড়ী মার মন রাখতেই হবে। এক পা দু' পা করে ভোম্বল বাড়ীর পেছনকার জঙ্গলে গিয়ে হাজির হল।

কত রকম গাছ-গাছড়া আর ঝোপ-জঙ্গল—দেখলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছ মেলে না। একটা পাতার সঙ্গে আর একটা পাতার তুলনা হয় না।

গাছের ওপরে ঝোপ-ঝাড়ে কত নমুনার পাখী যে মিষ্টি সুরে ডাকছে, শুনলে দু'কান ভরে যায়। মনে হয় না যে আবার লোকালয়ে ফিরে যাই। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—অলস-মন্থর-মধুময় রাজ্যি।

ঘুরে ঘুরে এক আঁটি ঢেঁকিশাক সংগ্রহ করলে ভোম্বল।

বুড়ী মা দেখলে নিশ্চয়ই খুশী হবে; বলবে—সরষেবাটা দিয়ে চচ্চড়ি করে দিই!

হঠাৎ একটা পাখীর ডাকে ভোম্বল থমকে দাঁড়ালো।

ভারী সুন্দর পাখীটা ত' ! ছোট্ট একটা ডাল থেকে তার রঙ-বাহারি ল্যাজ ঝুলিয়ে দিয়েছে আর চড়া সুরে একটা গান ধরেছে।

সত্যি দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে শোনবার মতো গান। ভোম্বল অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল—ঠিক খেয়াল ছিল না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা মোটা গলার হুঙ্কার শোনা গেল—পাখীর গান শুনলেই কি জীবন কাটবে ?

ভোম্বল অবাক হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, জীবনদা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে একটা বোঁচকা, অপর হাতে একটা লম্বা লাঠি।

আনন্দে চীৎকার করে উঠলো ভোম্বল—জীবনদা !

—হ্যাঁ, আমি।

'আজকে যে তোর কাজ করা চাই—
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই—
ওরা যতই জোরে মারবে রে ঘা—
তন্দ্রা ততই ছুটবে।'

ভোম্বল জবাব দিলে, 'সে-কথা ত' বুঝলাম। কিন্তু কোথায় যেতে হবে ?

—এক্ষুণি আমার সঙ্গে চলে আয়। অনেক কাজ জমে আছে। পাখীর গান শোনা হবে পরে।

ভোম্বল উত্তর দিলে—পাখীর গানের ক্ষণিক মোহ আমার কেটে গেছে। কিন্তু এই শাকের আঁটি বুড়ী মাকে পৌঁছে না দিলে সে যে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে।

জীবনদা হেসে বললেন, 'কিন্তু পৌঁছে দিতে গেলে যে আরো বিপদ। বুড়ী মা এই শাক না খাইয়ে কি ছাড়বে ? তখন সমস্ত প্ল্যান যে বানচাল হয়ে যাবে।

ভোম্বল নিজের দুর্বলতার কথা বুঝলে। শাকের আঁটি ছুঁড়ে ফেলে দিলে জঙ্গলের মধ্যে, হাতাহালি দিয়ে রঙ-বেরঙের পাখীগুলেকে দিলে উড়িয়ে ! বললে, ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে মোর তরে—চলুন জীবনদা, কোথায় আমায় যেতে হবে।'

জীবনদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস ভাই। আমরা সবাই সৈনিক। সব সময় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ডাক এলেই সোজা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

দুই জনে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। আরো কিছুটা পথ চলবার পর দেখা গেল, একটা জীপ ওদের জন্য ঝোপে-ঝাড়ে মুখ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে।

সেই জীপে গিয়ে দুই জনে নিঃশব্দে উঠলো। কোথায় যেতে হবে—বিপ্লবীদের একথা জিজ্ঞেস করা বারণ। তাই ভোম্বল চুপচাপ জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—যদি সেখান থেকে কোনো নির্দেশ আসে।

পর্বতের ওপরকার বরফ ভেঙে যেন জীবনদা কথা বললেন। খুব সংক্ষেপে কইলেন—এবার তোকে কলকাতায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

জীবনদার মুখে এই কথা শুনে ভোম্বল যেন আঁতকে উঠলো ; তারপর বললে, ঝোপে জঙ্গলে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—এবার একেবারে রাজধানী কলকাতায় ? একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়বো যে জীবনদা !

জীবনদার মুখে মৃদু হাসি ; বললেন, 'ভয় কিরে ? আমিই ত' সঙ্গে রইলাম।

জীপ চলেছে উল্কা-বেগে। জীবনদা ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন—কলকাতায় আছে এক জাঁদরেল গোয়েন্দা। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা আর খেতাবের লোভে স্বদেশীওয়ালাদের বিভিন্ন ঘাঁটির একটি মানচিত্র তৈরী করেছে সে। এই মানচিত্র ধরে যদি টিকটিকির দল কাজ শুরু করে তা'হলে বিপ্লবী-দলের বিষম বিপদ ! কাজেই এই মানচিত্রটি চুরি করে আনতে হবে। কোথায় যেতে হবে—কি করে মানচিত্রটা সরিয়ে আনবে—সে সব পন্থা আমি বাতলে দেবো। তবে একটি কথা জেনে রাখ—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'।

শুনে ভোম্বল ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল।

কলকাতায় পৌঁছুতে ওদের সব রকম যানেরই ব্যবহার করতে হল। সাবধানের মার নেই ! অনেকটা ঘোরা পথ দিয়েই ওরা এসেছে। কি জানি, কখন কার সন্দেহ হয়, ঠিক ত' বলা যায় না !

কলকাতায় গিয়ে জীবনদা ভোম্বলকে একটা তেতলা বাড়ীর ফ্লাটে এনে হাজির করলেন।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম করে জীবনদা তেতলার একটা জানালার ধারে ভোম্বলকে নিয়ে হাজির করলেন। তারপর বললেন, 'ওই যে দূরে সাদা ফ্ল্যাট বাড়িটা দেখছিস্, ওটা হচ্ছে টিকটিকিদের আস্তানা। টিকটিকিরা যেমন বিপ্লবীদের পেছনে ঘোরে, ঠিক তেমনি বিপ্লবীরাও ওদের পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছে। তাদের কাজই হল ওদের কাজকর্ম আর গতিবিধি লক্ষ্য করা। ওরা যদি ফেরে ডালে ডালে, তবে আমরা ফিরি পাতায় পাতায়। হুঁ হুঁ ! তেতালার এই ফ্ল্যাটটা আমরা রেখেছি—ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে।

বলতে বলতে জীবনদা গিয়ে একটা বাইনাকুলার নিয়ে এলেন। প্রথমে নিজে ভালো করে দেখে নিয়ে ভোম্বলকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছিস্ তেতালার ফ্ল্যাট—ওইখানে তোকে যেতে হবে একটি চিঠি নিয়ে।

ভোম্বল ভয়ে ভয়ে বললে, 'কিন্তু টিকটিকিরা আমায় ওখানে ঢুকতে দেবে কেন ? একেবারে দিন দুপুরের ব্যাপার।

জীবনদার মুখে রহস্যময় মৃদু হাসি। বললেন, 'সব কথা তোকে বুঝিয়ে বলি। একটি চিঠি থাকবে তোর হাতে। নীচে দারোয়ান জিজ্ঞেস করলে বলবি, বড় সাহেবের চিঠি আছে। ভয় কিরে? বড় সাহেবের চিঠি আমরা আগেই যোগাড় করে রেখেছি।

—বড় সাহেবের চিঠি?

ভোম্বলের মুখে চোখে বিস্ময়।

জীবনদা বললেন—হুঁ হুঁ! বড় সাহেবের চিঠি।

এমন সময় একটি লোক জীবনদার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার অল্প বয়েস, কিন্তু তার চোখে মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলছে।

লোকটা এসে হাসতে হাসতে বললে, 'জীবনদা, একেবারে বড় সাহেবের হস্তাক্ষর জাল করে ফেলেছি! এ হস্তাক্ষর তার নিজেরও বোঝাবার উপায় থাকবে না। তার গিন্নী ত' কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

জীবনদা ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব অবাক হচ্ছিস্ বুঝি? এই ছেলেটির নাম শ্যামল। ও হচ্ছে বড় সাহেবের ষ্টেনো; আসলে কিন্তু আমাদের দলের বিপ্লবী। ভারী করিকর্মা ছেলে। বড় সাহেবের সব খবর এনে ওই ত' আমাদের সরবরাহ করে। এমন কি আমাদের কাজের সুবিধের জন্য বড় সাহেবের হাতের লেখা অবধি জাল করেছে। বাইনাকুলারে দিয়ে দেখ—একটি মহিলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছেন—উনি হচ্ছেন বড় সাহেবের বৌ।

এই চিঠি নিয়ে গিয়ে তোকে ওঁর হাতে দিতে হবে। তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবেন না। বিনা দ্বিধায় তোর হাতে তুলে দেবেন কাগজে মোড়া সেই ম্যাপটি। সেইটে এনে আমার হাতে দিলেই তোর ছুটি। কাজটা খুবই সোজা। এর সব কিছু কৃতিত্ব শ্যামলের। ও চেনা লোক। ওকে ত' আর পাঠাতে পারি না। তাই অচেনা মুখের দরকার। সেই জন্য ধরে নিয়ে এসেছি তোকে। ...বুঝলি ত বোকচন্দর?

ভোম্বল মাথা নেড়ে জানালে যে, সে সব কিছু বুঝে নিয়েছে।

চিঠিখানি নিয়ে ভোম্বলকে তখন এগুতে হল। সেই সাদা বাড়িটা সে ভালো করে চিনে নিয়েছে। গোবেচারী বয়ের ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হবে। জীবনদা তাকে সেই পোষাকেই সাজিয়ে দিয়েছেন।

গেটের দারোয়ান তাকে ঠিকই আটকেছিল। কিন্তু ভোম্বল চিঠি দেখিয়ে বলেছিল, বড় সাহেবের চিঠি আছে। মেম সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

দারোয়ান খোস্ মেজাজে ওর পথ ছেড়ে দিয়েছে। তেতলায় গিয়ে ভোম্বল খট্‌খট্ করে দরজার কড়া নাড়লে।

ভেতর থেকে সাড়া এলো—কে ?

ভোম্বল বললে, 'বড় সাহেবের চিঠি—

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

মেম সাহেব চিঠি নিয়ে পড়লেন। তারপর একবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,

,তুমি নতুন বয় বুঝি ?

সেলাম ঠুকে ভোম্বল জবাব দিলে—জি—হ্যাঁ !

তখন মেম সাহেব আলমারী খুলে কাগজে মোড়া ম্যাপটি ওর হাতে তুলে দিলেন।

আবার এক লম্বা সেলাম। তারপর জীবনদার ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে ভোম্বলের আর কতক্ষণ সময় লাগে ?

ম্যাপ পেয়ে জীবনদার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

এমন সময় একজন আধ-বয়সী লোক ছুটতে ছুটতে এসে বললে, ,জীবনদা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

—কেনরে কি হলো ? আসল মাল ত আমরা পেয়ে গেছি !

সেই আধ-বয়সী লোকটি বললে, 'কিন্তু ও যখন ম্যাপ নিয়ে ফিরে আসছিল, আমি তখন উল্টো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলাম, ওর কোনো বিপদ-আপদ ঘটে কিনা। দরকার হলেই এগিয়ে যাবো।

—তারপর ?

—প্লেন ড্রেস্‌পরা একটা টিকটিকি কি সন্দেহ করে ওর ফটো তুলে নিয়েছে।' ও কিন্তু জানতেও পারে নি।

জীবনদা এক মুহূর্ত্তে সচকিত হয়ে উঠলেন ; বললেন' 'আজই ভোম্বলকে সরিয়ে দিতে হবে।

—কোথায় —

—বাবুইবাসা বোর্ডিংএ।

॥ এগারো ॥

জীবনদা বললেন, 'আমার কিন্তু নৌকোতে যেতে ভারী আরাম লাগে।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে—কেন ?

জীবনদা জবাব দিলেন, 'বোকচন্দর' এইটে বুঝতে পারছিস্ নে যে, নৌকোতে ট্রেনের মতো ভীড় ঠেলতে হয় না,—এই গেল এক নম্বর। পেছনে টিকটিকি লাগবার

সম্ভাবনা কম,—এই হলো দুই নম্বর। দিব্যি নিরিবিলি ফুর্‌ফুরে হাওয়া খেতে খেতে এগিয়ে চলো—তাতে দারুণ ক্ষিদেটাও জমে,—এই হলো তিন নম্বর। হাটে বাজারে গঞ্জে যেখানে খুশী নৌকো লাগিয়ে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো,—এই হলো চার নম্বর। যত খুশী বই পড়তে পড়তে চলো, বাধা দেবার কিংবা বিরক্ত করবার কেউ নেই,—এই হলো পাঁচ নম্বর। যখন ঘুম পাবে দিব্যি পাটাতনের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করো' —এই হলো ছয় নম্বর।

ভোম্বল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, 'এই রকম কত নম্বরের ফিরিস্তি আপনার ট্যাঁকে আছে জীবনদা ?

শুনে জীবনদাও হাসতে লাগলেন ; বললেন, 'এই জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীদের হাতে নানা জাতের নৌকো আছে। প্রয়োজনবোধে তারা কাজে লাগায়। বিপ্লবীরা সবাই নৌকো বাইতে ওস্তাদ। তারা কখনো নৌকোর মাঝি, কখনো পাটের ব্যাপারী, আবার-অন্য সময় আমের কিংবা গুড়ের কারবারী সেজে বসতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। সব রকম ভাষাও তাদের ভালো রকম জানা আছে ; এই ধর্ ঢাকার 'বাঙালা' ভাষা, চাটগেঁয়ে ভাষা, যশুরে ভাষা, উড়ে ভাষা' হিন্দুস্থানী বাৎ, শান্তিপুরী মিষ্টি ভাষা সব কিছুই রপ্ত করতে হয়।

ভোম্বল তেমনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—বিপ্লবী মানে তা'হলে বহুরূপী ?

জীবনদারও দুই চোখে কৌতুক উপচে পড়ছে। বললেন, 'হ্যাঁ, বহুরূপী ত' বটেই। বহুরূপী না হলে টিকটিকির চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে কি করে ? কিন্তু সেইটেই বিপ্লবীর সব নয়, আংশিক রূপ মাত্র। বিপ্লবী যখন নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াবার ব্রত গ্রহণ করে, যখন সে ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা ডিনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়ে দেয়, অথবা বুদ্ধির লড়াইতে ইংরেজ সিভিলিয়ান-মিলিটারীকে কাবু করে, স্বদেশী ডাকাতি করে দেশের মহাজনদের অতিরিক্ত টাকা কেড়ে নেয়, কিংবা দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর জলপ্লাবনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তখন দেখতে পারবে তার অন্য রূপ। তখন আর বিপ্লবী বহুরূপী নয়।'

ভোম্বল মাথা নেড়ে জবাব দেয়—সে-কথা সত্যি।

ওরা কথা বলছিল, আর পালতোলা নৌকো এগিয়ে চলেছিল মন্থর গতিতে। নৌকো বেয়ে নিয়ে চলেছিল আর একজন বিপ্লবী।

সামনেই একটা চর পড়েছে।

জীবনদা হঠাৎ সেই চরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাঝিভাই, এই চরে নৌকোটা একটু থামাও ত'।'

ভোম্বলের মনে দারুণ কৌতুহল। সে শুধালে—কেন জীবনদা ? এই চরে আবার কি হবে ?

ততক্ষণে নৌকোটা চরের কিনারা ঘেঁষে হাজির হয়েছে। জীবনদা এক লাফে সেই চরের ওপর নেমে পড়লেন। তারপর চট্ করে দুটো 'কাউঠ্যা' ধরে ফেললেন। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এই কাউঠ্যার মাংস ভারী সুস্বাদু। সেই কখন শেষরাত্তিরে রওনা হয়েছি। আজ দুপুরের খাওয়াটা ভারী জবর হবে দেখা যাচ্ছে।

ভোম্বল কখনও কাউঠ্যা খায় নি। সে আপত্তি করে বললে, 'উঁহুঁ! ওই বিচ্ছিরি জানোয়ার আমি খাচ্ছি না।'

জীবনদা তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—আচ্ছা. এখন আমি কিছু বলছি না। খাওয়ার সময় দেখা যাবে।

দুপুরবেলা তিনজনে মিলে যখন খেতে বসেছে, হাঁড়ির ভাত কেবিল কমে যাচ্ছে। জীবনদা একাই অর্দ্ধেক হাড়ির ভাত শেষ করে দিয়েছেন।

ভোম্বল কলাপাতাটা চেটেপুটে সাফ করে নিয়ে করুণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, ওই কাউঠ্যার মাংস হাঁড়িতে আর আছে?'

এইবার ভোম্বলের কথা শুনে জীবনদা একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন। দুটো গাং-শালিক সেই হাসির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নৌকো চলল। সন্ধ্যের মুখে নৌকো গিয়ে বাবুই-বাসা বোর্ডিং-এর ঘাটে লাগল।

ছেলের দল কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়েছে যে ভোম্বল এসে গেছে।

অমনি তারা দল বেঁধে ঘাটে হাজির হয়ে ভোম্বলকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এক মিছিল বের করলো।

সকলের আগে যে ছেলেটি ছিল সে হাঁক দিলে—জনাব মীরজাফর জিন্দাবাদ!

অমনি সবাই এক জিগীরে সায় দিয়ে—জনাব মীরজাফর জিন্দাবাদ!

এই জয়ধ্বনি শুনে ভোম্বল একেবারে হকচকিয়ে গেল।

এতদিন বাদে সে বাবুইবাসা বোর্ডি-এ ফিরছে—ভেবেছিল কত আনন্দ করবে ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু সে রাতারাতি জনাব মীরজাফর হলো কি করে—ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলো না।

অ্যাঁ! সে কি বিশ্বাসঘাতক? সে কি মীরজাফর? ভাবলে, জীবনদাকে হাঁক দিয়ে সত্যিকারের কারণটা জিজ্ঞেস করে। পেছনে তাকিয়ে দেখলে, জীবনদা তার কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে গেছেন।

এখন হাঁক-ডাক করে বিশেষ সুবিধে হবে না। মনে মনে ভাবলে—পড়েছি ছেলেদের হাতে, চলে যেতে হবে সাথে।

কিন্তু অনেক মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারলো না, সে হঠাৎ মীরজাফর বনে গেল কোন্ সুকৃতির ফলে।

আসল কারণটা জানা গেল আর একটু বাদেই। ছেলের দল ওকে নিয়ে মিছিল করে যখন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ভেতরকার উঠোনে উপস্থিত হলো, তখন সামনে চোখে পড়লো একটা সাজানো-গোছানো ষ্টেজ।

একটা ছোট ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হলো ভোম্বলের সামনে; তারপর তার গলায় একটা মালা পরিয়ে দিয়ে কুর্নিশ করে সজোরে বললে—বন্দেগী জনাব মীরজাফর!

ভোম্বল চীৎকার করে বললে—হ্যাঁরে তোদের ব্যাপারটা কি বল ত! আমি মীরজাফর? আমি বিশ্বাসঘাতক? আমি···আমি···

একটি ক্যাপ্টেন-গোছের ছেলে এগিয়ে এসে হুঙ্কার দিলে—তুমি যা-ই হও, আজ রাত্তিরের জন্য তুমি সিপাহসালার মীরজাফর।

—তার মানে?

—তার মানে তুমি মীরজাফর না সাজলে আজ আমাদের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। তাই আর কথা নয়—চট্‌পট্ মীরজাফরের পোষাকটা পরে তৈরী হয়ে যাও। চূণ-কালি যা মাখবার ওরাই দেবে'খন।

ভোম্বলের অবাক হবার ঘোর তখনো কাটে নি; তাই জিজ্ঞেস করলে—তোরা ত' আজ রাত্রে সিরাজদ্দৌলা নাটক করছিস্। সেটা না হয় বুঝতে পারলাম। কিন্তু আসল মীরজাফর যে সেজেছিল, সে গেল কোথায়? তাকে ধরে এনে রঙ মাখিয়ে দে না। মিছিমিছি আমায় নিয়ে টানাটানি করছিস্ কেন?

ছেলেটি বললে—তার কি আর যো আছে ভোম্বলদা? সে এখন তিনখানা কম্বলের তলায় কোঁ-কোঁ করছে। যা ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনি সুরু হয়েছে, তাতে আর তাকে পার্ট বলতে হবে না! দেখ গে, সাতজনে মিলে চেপে ধরে আছে তাকে।

—তবে উপায়?

—উপায় তুমি। তাই যেই শুনলাম—এদ্দিন পরে তুমি বোর্ডিংএ ফিরে এসেছ, অমনি বুঝে নিলাম তুমিই আমাদের মুস্কিল-আসান।

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো—যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান!

ভোম্বল বললে—এ ত ভালো জ্বালায় পড়লাম। কিছু জানি না, শুনি না, একটু-খানি পার্ট পর্যন্ত মুখস্থ নেই—আমি কি করে মীরজাফরের পার্ট করবো? না না, সে আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।

ছেলের দল আবদারের সুরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—আমাদের দাবী না মানলে জ্যান্ত পুতে ফেলবো।

সেই ক্যাপ্টেন ছেলেটি এগিয়ে এসে ভোম্বলের দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললে—দোহাই তোমার ভোম্বলদা, এই বাবুইবাসা বোর্ডিংএ এমন একটি ছেলেও নেই যে মীরজাফরের জটিল পার্টে নামতে পারে! তাই শেষ পর্যন্ত ভগবান আমাদের মুখ রক্ষা করেছেন।

ভোম্বল মুচকি হেসে উত্তর দিলে—ভগবানে দেখছি তোদের অগাধ বিশ্বাস! তা সেই ভগবান ব্যাটাকে ধরে-পাক্ড়ে মীরজাফর সাজিয়ে দে না, তা'হলে সব ল্যাঠা চুকে যায়।

ছেলেটি কিছুতেই দমবার নয়। উত্তর দিলে—ভগবান এখন ভোম্বলের মূর্তি ধরে আমাদের মুস্কিল আসান করতে এগিয়ে এসেছেন। কাজেই তাকে এখন ফেরাবো—আমাদের সাধ্য কি?

ওই যে কথায় বলে না,—দশচক্রে ভগবান ভূত।

শেষ পর্যন্ত ভোম্বলকে ভূতই সাজতে হলো।

উৎসাহী ছেলের অভাব নেই। তারাই এগিয়ে এসে মীরজাফরের মুখে রঙ লাগালে, দাড়ি গজিয়ে গেল মীরজাফরের, বাব্ড়ী চুল হলো, সিপাহসালারের ঝক্মকে পোষাক গায়ে, নাগ্রা জুতো পায়ে, কোমরে তলোয়ার, আঙুলে হীরের আংটি ঝক্মক্ করছে!

জীবনদাও তখন ওকে দেখে চিনতে পারলেন না!

প্রাণে ভয় আছে বৈ কি ভোম্বলের। নাটকের ভেতর সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে কিছু জানে না। সেই ছেলেবেলায় কবে পাশের গাঁয়ে এই 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক দেখেছিল, তারই আব্ছা ছায়া যেন চোখের সামনে ভাসছে।

কিন্তু সেইটুকু ভরসা নিয়ে কি ভাঙা ডিঙি দরিয়ায় ভাসানো চলে?

সাজ-পোষাক পরবার পর ওর সারা গা দিয়ে যেন কুল-কুল করে ঘাম বইতে সুরু করলো।

ভোম্বলের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছেন জীবনদা। তাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন। তারপর ওকে অভয় দিয়ে বললেন—ভয় নেইরে বোকচন্দর। আমি এমন করে প্রম্পট্ করবো যে তোর কোন অসুবিধেই হবে না। একটুখানি উইংস্ ঘেঁষে দাঁড়াবি, আর সব সময় কান খাড়া রাখবি। তা' হলেই তোর শুনতে বা বলতে কোনো অসুবিধেই হবে না।

এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ভোম্বল।

জীবনদা যদি পরিষ্কার করে কথাগুলো বলে যান, তবে একরকম করে চালিয়ে যেতে পারবে ভোম্বল। ওর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

আকস্মিকভাবে ভোম্বলকে পেয়ে ছেলের দলের উৎসাহও খুব বেড়ে গেল।

তারা সবাই এইবার নিজেদের মেক-আপ নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলো।

তখনই বাইরে কনসার্ট বেজে উঠলো। কনসার্টের শব্দে সারা উঠোন গমগম করতে লাগলো।

আশেপাশের গাঁ থেকে অভিনয় দেখবার জন্য অনেক লোক এসে জড় হয়েছে। তার ভেতর মেয়েছেলে আর ছোটদের সংখ্যাই বেশী। বাইরে রাস্তার ওপর পান-বিড়ির দোকান, তেলেভাজার দোকান, লেনোমেডের দোকান—সব বসে গেছে। খাবার দোকান নেই বটে, কিন্তু গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে এক কোণে।

ওদিকে তিনটে বেল দিতেই ড্রপ উঠে গেল। সারা উঠোনময় লোকের মাথা গিসগিস করছে। প্রথম দৃশ্যে আলিবর্দ্দী আর সিরাজ বেশ ভালোই করলে।

তার পরেই মীরজাফরের গোপন মন্ত্রণার দৃশ্য। ভোম্বল দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে জীবনদার দিকে কান খাড়া করে রাখলে।

বুড়ো মানুষ—তার ওপর ষড়যন্ত্রকারী। বেশ থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাই প্রথম থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দৃশ্যটি শেষ হয়ে গেলে সবাই এসে ভোম্বলকে তারিফ করলে।

আরো গোটা কয়েক দৃশ্য পর পর হয়ে গেল। বোঝা গেল, নাটক বেশ জমে উঠেছে।

এমন সময় হঠাৎ জীবনদার গলা শোনা গেল—ড্রপ ফেলে দাও—ড্রপ ফেলে দও!

আচম্‌কা ড্রপ পড়ে যেন নাটকের ছন্দপতন ঘটালে।

জীবনদা ছুটে এসে বললেন, 'একদল পুলিশ নমশূদ্রপাড়ায় গিয়ে অত্যাচার করছে। ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। যে যেখানে আছ—সবাই চলে এসো আমার সঙ্গে। আগুন নেভাতে হবে—নইলে ঐ পাড়াকে-পাড়া পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সবাই সৈনিকের মতো প্রস্তুত হল।

একদল ছেলে কিছু হাঁড়ি, কলসী, বালতি যোগাড় করে নিলে। পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নেভাতে হবে।

জীবনদা সবার আগে, আর সবাই সৈনিকের মতো লাইন করে এগিয়ে চলেছে।

ভোম্বল তাকিয়ে দেখলে—দূরে নমশূদ্রপাড়ার আকাশটা লালে-লাল হয়ে গেছে।

ওখানে কে সর্বনাশের আবীর খেলছে?

॥ বারো ॥

এই নমশূদ্রের দলের অনেকে বিপ্লবীদের লাঠিখেলা শেখাতো। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলেই এই পাড়ার ডানপিটে ছেলেরা বিপ্লবীদের গোপন চিঠি নিয়ে দূরের পথে নৌকো ভাসিয়ে দিত।

খবরটা কি করে পুলিশের কানে ওঠে। তাই আজ রাত্তিরে অতর্কিতে তাদের এই অভিযান।

এই অঞ্চলের দারোগা অতি জবরদস্ত লোক—কাকেও ধরে আনতে বললে একেবারে বেঁধে নিয়ে আসে!

ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে একটু ইঙ্গিতমাত্র পেয়েছিল যে, এই নমশূদ্রপাড়াকে শায়েস্তা করতে হবে। তাই দারোগার মন একেবারে খুশীতে ভরে উঠলো। এই জাতীয় ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার কাজে দারোগার ভারী উল্লাস।

আগে থাকতেই সে মনে মনে ফন্দী এঁটে রেখেছিল। দারোগা খবর নিয়ে জেনেছিল যে, সেই রাত্রে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেরা নাটক করবে। তাই গ্রামশুদ্ধ লোক ঐখানেই ভীড় করেছে। কাজেই নমশূদ্রপাড়াকে শায়েস্তা করার এই সুবর্ণ সুযোগ।

দারোগার মনে হল, সে যেন সত্যি যুদ্ধযাত্রায় যাচ্ছে। তাই পাহারাওলা-জমাদারদের হাতে শুধু লাঠিসোটা দিয়েই খুশী হয় নি, অতি-উৎসাহে নিজে গেছে সঙ্গে। ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে ত'!

দারোগার মনে ভরসার কথা এই ছিল যে, সেই রাত্রে বোর্ডিং-এর ছেলেরা কেউ আর বাধা দিতে আসবে না। তারা ত' সবাই নাটক নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

দারোগার উদ্যোগ-পর্বটা হয়েছিল ভালোই। রাতের মিশ্-কালো আঁধারে ওরা গিয়ে নমশূদ্রপাড়া ঘেরাও করে ফেলেছিল। তারপর নির্বিকারে লাঠি চালিয়েছে। ছোট-বড় কাউকে রেহাই দেয় নি পাহারাওলা-জমাদারের দল।

এই অত্যাচার করেই কিন্তু দারোগা খুশী হয় নি—নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে নমশূদ্রপাড়ার ঘরে ঘরে।

দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা যখন আকাশ ছুঁয়েছে তখনই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউস থেকে তা ছেলেদের চোখে পড়েছে। তাই ওরা আর কালবিলম্ব না করে জীবনদাকে গিয়ে খবর দিয়েছে। তার ফলে, ওদের অভিনয়ের মাঝখানেই ড্রপ ফেলে দিতে হয়েছে।

জীবনদার অধিনায়কতায় ছেলের দল যখন নমশূদ্রপাড়ায় গিয়ে হাজির হল, তখন দেখা গেল—মহাভারতের সেই পাণ্ডব-দাহন পর্ব সুরু হয়ে গেছে।

'আগুন আগুন' চীৎকার করতে করতে ছেলের দল এগিয়ে গেল।

দারোগা দেখলে মহাবিপদ। তার সবকিছু গুণপনা এক্ষুণি ধরা পড়ে যাবে! তাই সে পাগলের মতো সিটি বাজিয়ে—দলবল নিয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ দৌড়!

পুলিশের দল যখন প্রস্থান করল তক্ষুণি সুরু হল জীবনদার আর্তত্রাণের কাজ।

তিনি ছেলেদের দলে দলে ভাগ করে দিলেন। এক দল পুকুর আর ডোবা থেকে কলসী করে জল তুলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগুন নিভিয়ে ফেলবে। তারা সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল। হাতে হাতে জল ভর্ত্তি মাটির কলসী উঠে এল পুকুর থেকে, তারপর কুঁড়েঘরের আগুনের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আর একদল ছুটোছুটি করে দেখতে লাগল কে কোথায় চোট খেয়েছে, কিম্বা আগুনে পুড়ে গেছে।

আর একদল তৈরী হয়ে রইল প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল—বিপদের আভাস পেয়েই নমশূদ্রপাড়ার মেয়েরা ঝোপে-জঙ্গলে আর ডোবার জলে আশ্রয় নিয়েছিল।

এখন পুলিশের দল পালিয়ে যেতে—সেই মেয়েরা কেউ ঝোপ-জঙ্গল থেকে, কেউ পানা-পুকুরের ভেতর থেকে, কেউ নিকটবর্তী পাটক্ষেত থেকে এসে পাড়ায় জড় হল। কিন্তু তাদের ছোট ছোট বসতবাটি আগুনে জ্বলছে দেখে সকলের বুকফাটা কান্নার রোলে আকাশ-বাতাস একেবারে ভারী হয়ে উঠল।

পাড়ার জোয়ান নমশূদ্রের দল পুলিশের সঙ্গে খুব লড়েছে। পুলিশের কয়েকজনও বেশ ঘায়েল হয়ে ফিরে গেছে। কাজেই ওদের আক্রোশটা রয়েই গেল। কখন যে আবার পুলিশের দল প্রতিহিংসার জন্য রাতের আঁধারে ফিরে আসবে—সে-কথা ঠিক করে বলা শক্ত।

হঠাৎ একটা করুণ কান্নার শব্দ শুনে জীবনদা সচকিত হয়ে উঠলেন।

তাই ত! ডোবার ধারে এমন করে কাঁদে কে? কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জীবনদা সেই দিকেই ছুটলেন।

একজনের হাতে একটা টর্চ ছিল। সে আলো জ্বালাতেই দেখা গেল, ডোবার ঠিক কিনারায় একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে। সে দারুণ যন্ত্রনায় চীৎকার করছে।

এরাই তাকে টেনে তুলতে গিয়ে দেখলো, হাঁটুটা তার একেবারে ভেঙে গেছে। জমাদার লাঠি চালিয়ে ওই ছোট মেয়েটার হাঁটু একেবারে অকেজো করে দিয়েছে। তার আঘাত এত তীব্র হয়েছে যে, মেয়েটার গোটা মুখটা একেবারে নীল হয়ে গেছে!

জীবনদা নিজে তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বেচারীর পা-টা সত্যি ভেঙে গেছে—দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

সেই জন্যই মেয়েটির এই বুকফাটা কান্না। ইতিমধ্যে মেয়েটির মা এসে সেখানে হাজির হয়েছে। সে ক্রমাগত মাথা কুটতে লাগলো আর কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো—ওই আমার একমাত্র মেয়ে দুখ্‌নী। মুখপোড়া পুলিশরা এসে আমার বাছার পা ভেঙে দিয়ে গেল। এখন কি করে আমি ওকে বাঁচাবো? সারা জীবন ওর কি ভাবে কাটবে? দুখ্‌নীর যে আর কেউ নেই!

দুখ্‌নীর মায়ের কান্নায় সবার চোখ জলে ভরে এলো।

এ অঞ্চলে যে ডাক্তার আছে—সে আবার পুলিশের হাতে ধরা। তাকে ডাকলে সে যে আসবে না সে-কথা জীবনদা বিলক্ষণ জানতেন।

জীবনদা ডাকলেন—ভোম্বল!

ভোম্বল জবাব দিলে—বলুন জীবনদা!

জীবনদা ওকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে কইলেন—তোকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে—

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে—কোথায় জীবনদা?

জীবনদার মুখে-চোখে দারুণ যন্ত্রনা! যেন আঘাতটা তিনিই পেয়েছেন। আর এই চরম আঘাত যেন তিনি কিছুতেই সইতে পারছেন না। একটুখানি চুপ করে রইলেন জীবনদা; তারপর বললেন—আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। নৌকো করে তাড়াতাড়ি চলে যা ভোম্বল। মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যা। নদীর ধারেই একটা গাঁ। সেই গাঁয়ে আছে আমার এক ডাক্তার বন্ধু। সে বিপ্লবীদেরও বন্ধু। ঘাটে নৌকো বাঁধাই আছে, আর দেরী করিস্ নে। নির্দ্দোষ মেয়েটার এই ব্যথা আমি আর সইতে পারছি নে।

জীবনদার মুখে এই কথা শুনে দুখ্‌নীর মা এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো; বললে—দাদাবাবু, আমাকেও পাঠিয়ে দাও আমার মেয়ের সাথে। ওকে ছেড়ে একা একা আমি কি করে থাকবো? ঘর ত' পুড়েছেই। এইবার পুলিশ মুখপোড়ারা এসে আমাদের জ্যান্ত পুঁতে রাখবে।

ওর কথা শুনে জীবনদা বললেন, 'সেই ভালো রে ভোম্বল। দুখ্‌নীর শোকাতুরা মাকেও তোদের সঙ্গে নিয়ে যা। নইলে এখানে থেকে ও বুড়ী শুধু বুক চাপড়াবে, আর কেবলি কেঁদে ভাসাবে।'

একজন ছেলে টর্চ ধরলে, আর জীবনদা পকেট থেকে কাগজ বের করে খস্‌খস্ করে একটা চিঠি লিখে দিলেন। তারপর ছেলেদের বললেন—ওরে তোরা ধরাধরি করে দুখ্‌নীকে নৌকোয় তুলে দে।···ভোম্বল!

ভোম্বল জবাব দিলে—আমি তৈরী জীবনদা!

জীবনদা বললেন, 'আচ্ছা তোরা এগো, আমরা বাদবাকি সবাই এই দিকটা সামলাচ্ছি।'

আগে আগে টর্চ দেখিয়ে চললো একটি ছেলে। আর চারজন দুখ্‌নীকে আল্‌তো করে তুলে নিল। সঙ্গে চললো দুখ্‌নীর মা আর ভোম্বল।

ঘাটে নৌকো তৈরীই ছিল। আস্তে আস্তে ওরা দুখ্‌নীকে তুলে শুইয়ে দিল নৌকোর পাটতনেও ওপর। দুখ্‌নীর মা গিয়ে বসলো ওর পাশে।

নিঃশব্দে নৌকো ছেড়ে দিল।

মিশ্‌কালো আঁধার রাত।

ভোম্বল বসে বসে ভাবছিল।

মাথার ওপর রাশি রাশি তারা জ্বলছে আর নিভছে। কি ইঙ্গিত ওরা করছে—ভোম্বল তা জানে না। অবাক হয়ে ভোম্বল ওই দিকে তাকিয়ে রইলো। তার জীবনে যে নাটকের অভিনয় চলছে তা যেমন বিচিত্র—তেমনি অভিনব।

ওই তারাগুলোও কি গগনের মঞ্চে অভিনয় করে চলেছে? ওদের নাটকের বিষয়-বস্তুটা কি ভোম্বলের জানা নেই।

এই ত' খানিক আগে ভোম্বলও অভিনয় করেছিল। সেখানে তার পার্ট ছিল 'মীরজাফর'। এখন আবার সে নতুন ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে। এখানে তার আর্তত্রাণের ভূমিকা। এই পার্টে অভিনয় করে সে দর্শকবৃন্দের হাততালি কুড়োতে পারবে কিনা সে জানে না। পার্ট তার ভালো করে মুখস্থ নেই, তবু তাকে মঞ্চের ওপর অভিনয় করে চলতে হবে। মীরজাফরের ভূমিকায় ভরসা ছিলেন জীবনদা। কিন্তু এই মঞ্চে কে তাকে প্রম্পট্‌ করে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে?

নিশুতি রাতে নৌকো এগিয়ে চলেছে। একটি ছোট্ট লণ্ঠন জ্বলছে নৌকোর ভেতরে। তারই মৃদু আলোতে দেখা যাচ্ছে দুখ্‌নীর মা মাঝে মাঝে ঘুমে ঢলে পড়ছে, আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠে মেয়ের রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

থেকে থেকে দুখ্‌নীর কাতরানি শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ও ঘুমিয়ে পড়ছে কিনা ভোম্বল ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না।

একটা গুবরেপোকা কেবলি সেই ছোট্ট লণ্ঠনটার কাচের ওপর মাথা ঠুকে মরছে। কোন্ অবিচারের প্রতিকারের আশায় গুবরেপোকাটা ক্রমাগত লণ্ঠনের কাচের ওপর মাথা ঠুকছে ভোম্বল আন্দাজ করতে পারে না।

ভোম্বল বোধ হয় এক সময় নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় নৌকোর ছৈয়ে ঠেস্‌ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দুখ্‌নীর কাতর আর্তনাদে ওর ঘুমটা আচম্‌কা ভেঙে গেল।

দুখ্‌নীর মা কেঁদে বললে,'দাদাবাবু, পা-টা ত' এরই মধ্যে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আমার একটু ঢুলুনি এসেছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। পায়ের টন্‌টনানিতে ও যে কেবলি কেঁদে কঁকিয়ে উঠছে।'

ভোম্বল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তা'হলে কি করা যায় ?

দুখ্‌নীর মা বললে, 'তুমি নৌকোটা একটু এই জঙ্গলের কিনারে লাগাতে বলো, আমি হাড়-মচ্‌কানোর গাছ খুঁজে-পেতে নিয়ে আসি। তাই লাগিয়ে দিই মেয়েটার পায়ে। দেখবে বেদনা আর ফুলো অনেকটা কমে যাবে।'

যে মানুষটি এতক্ষণ নিঃশব্দে নৌকো চালাচ্ছিল সে বললে' 'এই আঁধার রাতে তুমি একা একা জঙ্গলে ঢুকবে কি করে ? সাপ-কোপের ভয়ও ত' আছে!

দুখ্‌নীর মা বললে, 'সাপ আমার কি করবে দাদাবাবু ? আমার কোমরে সাপের ওষুধ শেকড় বাঁধা আছে। কোনো ভয় নেই আমার। তুমি একটু নৌকোটা কিনারে লাগাও দাদাবাবু। মেয়েটার কষ্ট আমি আর দু'চোখ মেলে দেখতে পারছি না।'

দুখ্‌নীর মায়ের কথায় জঙ্গলের ধারে নৌকো লাগানো হল। রাশি রাশি জোনাকি সেই জঙ্গলে যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা বড় কাস্তে হাতে নিয়ে দুখ্‌নীর মা লাফিয়ে নেমে গেল সেই জঙ্গলে।

ভোম্বল ভেবে দেখলে, কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। একা একা এই বুড়ী যাবে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর, আর সে আরাম করে নৌকোয় বসে ঘুম লাগাবে ? সেও এক লাফে তীরে উঠে বুড়ীর পেছন পেছন রওনা হল।

দুখ্‌নীর মা দুই হাতে ঝোপ-জঙ্গল সরাচ্ছে আর এগিয়ে যাচ্ছে।

বাধ্য হয়ে ভোম্বলকেও সেই আঁধার রাতে সেই জোনাকীর পিদিম-জ্বালা পথে এগুতে হল।

হঠাৎ পেছনদিকে গর—র্‌-র্‌-র্‌ ফ্যাঁস্‌! একটা বুক-কাঁপানো আওয়াজ সারা বনভূমিকে যেন নাড়িয়ে দিল।

ভোম্বলের ঘাড়ের ওপর একটা বাঘ লাফিয়ে পড়েছে।

ভোম্বলের আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের মধ্যে দুখ্‌নীর মা পেছনদিকে লাফিয়ে এল, তারপর মহিষ-মর্দ্দিনীর অসীম শক্তিতে সেই বাঘটার গলায় কাস্তেটা একেবারে আমূল বসিয়ে দিল!

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল বাঘের গলা থেকে।

॥ তেরো ॥

কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

সেই আঁধার রাতে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা বনে বাঘটা যে ভাবে লাফিয়ে এসে ভোম্বলের ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল, তার আঘাত বড় কম ছিল না।

নৌকোর মাঝি বাঘের ডাক আর ওদের চীৎকার শুনে তাড়াতাড়ি নৌকো থেকে একটি রামদা নিয়ে ছুটে চলে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে বুড়ীর কাস্তের আঘাতে বাঘটা অক্কা পেয়েছে। যাবার আগে সে মরণকামড় বসিয়ে দিয়ে গেছে ভোম্বলের ঘাড়ে।

নায়ের মাঝি গোটা রাস্তায় চুপচাপ নৌকো চালিয়ে এসেছে।

এই মাঝিটিও বড় সোজা লোক নয়—একজন নামকরা বিপ্লবী। গায়ে অসুরের মতো শক্তি। কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। নৌকো চালাচ্ছে ত' নৌকোই চালাচ্ছে। তখন তাকে দেখে মনে হবে, নৌকো বাওয়া ছাড়া জগতে তার অন্য কোনো কাজ নেই। কিন্তু সত্যিকারের বিপদ যখন মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন তার সিংহমূর্ত্তি সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বাঘের থাবায় ভোম্বলকে অচৈতন্য হতে দেখে মাঝিটি যেন তার সত্যিকারের বিপ্লবী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল।

কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে নিয়ে মাঝিটি বললে, 'বুড়ি মা, তুমি তাড়াতাড়ি নৌকোয় ফিরে যাও। মেয়েটা ওখানে একলা পড়ে আছে। বিপদ-আপদের কথা ত কিছু বলা যায় না। আমি ভোম্বলের দেহটা তুলে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।'

বুড়ী বললে, 'যার জন্য আসা, তার ত কিছুই হল না বাবা, মাঝখান থেকে ছেলেটা বাঘের থাবা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল! আমার হয়েছে বাবা শ্রীবৎস রাজার বরাত। হাতের পোড়া শোলমাছও নদীর জলে পালিয়ে যায়।'

মাঝিটি বললে, 'সে জন্য আর আফশোষ করে লাভ কি মা? বিপদ-বাধা এলে আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। নইলে কিন্তু আমরা আরো বিপদে জড়িয়ে পড়বো।

হঠাৎ বুড়ী আনন্দে চীৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি বাবা, পেয়েছি। একটা ঝাড়-মচ্‌কা গাছের ওপরেই যে বাঘটা পড়ে আছে। আমি এই গাছের পাতা নিয়ে এগুই। তুমি ছেলেটাকে একা তুলতে পারবে ত'?'

মাঝি মৃদু হেসে উত্তর দিলে—এর তিন ডবল ভারী জিনিসও আমি কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলতে পারি।

বুড়ী নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, 'তবে আর ভাবনাটা কিসের? আমি গাছের পাতা নিয়ে নৌকোয় যাচ্ছি- তুমি বাছা যেন বেশী দেরী কোরো না। একে অচেনা জায়গা তার ওপর রাত-বিরেতের ব্যাপার। শীগগির আমাদের নৌকো ছেড়ে দিতে হবে। ছেলেটারও ত' চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করতে হবে।'

তারপর কি যেন চিন্তা করে বুড়ী বললে, 'এ হল ভালো। ছিল একজন রোগী, এখন দুইজনকে নিয়ে আমাদের রাত জাগতে হবে।

মাঝি জবাব দিলে—সে জন্য আমাদের কোনো ভাবনা নেই মা। যে ডাক্তারের কাছে আমরা যাচ্ছি, তিনি খুব বিচক্ষণ মানুষ। আমাদের একেবারে ঘরের লোক। আর তা ছাড়া রোগ ভালো করবার ব্যাপারে তাঁর যে হাতযশ আছে তার বুঝি তুলনা হয় না। নিজে থেকে ইচ্ছে করে গ্রামদেশে পড়ে আছেন আর আমাদের মতো সাধারণ লোকের উপকার করছেন। নইলে সহর অঞ্চলে গিয়ে ডিসপেন্সারী খুলে দিলে উনি হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারতেন। বললে বিশ্বেস করবে না মা, উনি গরীবের একেবারে মা-বাপ!

বুড়ী তার দুটি হাত জোড় করে একবার প্রণাম জানালে।

সে প্রণাম ভগবানের চরণে পৌঁছুলো, কি মানুষ-ডাক্তারের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হল—সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

তখনো বেশ রাত রয়েছে।

নায়ের মাঝি দুইটি শক্ত রোগীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকো চালিয়ে দিয়েছে। কে জানে হয়ত ভোরের শুকতারার উদয়ের সম্ভাবনায় এই একক মাঝিকে আশান্বিত করে তুলেছে।

বাঘের থাবায় ঘায়েল হয়েছে ভোম্বল। ঘাড়ের কাছে তার গভীর ক্ষত। সেখান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

মাঝির মনে ভয়—শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না কি?

ওপাশে বুড়ীর মেয়েটাও ঝিম্ মেরে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ আগেও তার কাতর-আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। এখন মেয়েটার মুখে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। পায়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে কি সত্যি ঝিমিয়ে পড়ল?

বুড়ী ত' নৌকোয় ফিরে ওর পায়ে কি সব পাতা থেঁতো করে বেঁধে দিয়েছে। সেই বনৌষধির গুণেই কি মেয়েটা এখন এমন ভাবে চুপচাপ করে চোখ বুজে শুয়ে আছে?

মাঝি প্রাণপণে দাঁড় টানছে।

আর কোনেমতেই দেরী করা চলে না। ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। নইলে তিনি যদি আবার ঘোড়ায় চেপে অন্য গ্রামে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়েন, তা'হলে হবে মহা-বিপদ! দু'দুটো মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে তা'হলে সে সত্যি বিপদে পড়ে যাবে।

কেন না,—সারা অঞ্চল টহল দিয়ে তিনি যে কখন বাড়ি ফিরবেন তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। শক্ত রোগী হাতে পড়লে তিনি অনেক সময় রোগীর বাড়িতেই আস্তানা গেড়ে বসেন। তখন তাঁকে খুঁজে বের করা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে।

নৌকোর মাঝি এই সব কথা আপন মনে ভাবেছ আর তার বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় টেনে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বুড়ীরও কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর পর পর বিপদের আঘাতে বুড়ীও নৌকোয় পাটাতনের ওপর নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

ওর দেহে যে প্রাণ আছে—হঠাৎ দেখলে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছে না।

মাঝি মনে শক্তি সঞ্চয় করে। নাঃ, তাকে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না।

শেষরাত্তিরে নদীর শীতল বাতাস যেন তার কপালে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। সে আপন মনে গুণ-গুণ করে গান ধরে—

'—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে—'

ছোট নৌকো তর্‌তর্ করে এগিয়ে চলে সমুখ পানে।

ভোরের মুখে নৌকো গিয়ে ডাক্তারবাবু ঘাটে লাগল।

ডাক্তারবাবুও তখন সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন আর মাথা নেড়ে গান গাইছেন—

'আকাশভরা সূর্য-তারা—বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান!'

দীর্ঘদেহ সৌম্যমূর্ত্তি পাকা-চুল-দাড়ি—দূর থেকে ঠিক প্রাচীন যুগের ঋষির মতো মনে হয়। কিন্তু এই বয়েসেও চোখের জ্যোতি এতটুকু ম্লান হয় নি!

হঠাৎ নৌকোটা চোখে পড়তেই গান থামিয়ে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু—কি গো ঘাটের মাঝি, এবার ক'টা মরা আবার বৈতরণী-তীরে নিয়ে এলে?

ডাক্তারবাবুর আচম্‌কা হুঙ্কার শুনে বুড়ীর ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলো সে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে—দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা!

কিন্তু ডাক্তারবাবুর 'মরা' কথাটা বুড়ীর কানে বড় বেসুরো ঠেকেছিল। তাই

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে—তোমার ত' বয়সের গাছপাথর নেই! তা এই সকালবেলা জ্যান্ত মানুষকে 'মরা 'মরা' করে হাঁক পাড়ছ কেন?

বুড়ীর কথা শুনে পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মাঝি এবার হাতের লগিটা তুলে রেখে বললে—বুড়ী মা, ডাক্তারবাবুর কথায় তুমি ভয় পেয়ো না। জ্যান্ত মানুষকে উনি 'মরা' 'মরা' করে হাঁকডাক করেন। তখন আমরা বুঝতে পারি, সেই মরার বুকে পরাণ ফিরে আসতে আর বেশীদেরী নেই।'

বুড়ী যেন সেই কথা শুনে লজ্জা পেল; বললে—ও মা! ডাক্তারবাবু নাকি? তা পেন্নাম হই ডাক্তারবাবু। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মেয়ে মানুষ। আমাদের কথা ধরো নি যেন। আমার দুই ছেলেমেয়েকে একেবারে জ্যান্ত করে দিতে হবে। নইলে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।

বুড়ীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু এগিয়ে এলেন। তারপর হাতের দাঁতনটা ফেলে দিয়ে নৌকোয় উঠে বললেন—কী সর্বনাশ, ওরে মাঝি, একেবারে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিস্ যে! কী কাণ্ডটা বল ত?

তখন নৌকোর মাঝি দুই রোগীর বিবরণ তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে দিলে।

বুড়ী বললে—আমি একটা গাছের পাতা থেঁতলে দিয়ে ছেলেটার রক্তপড়া বন্ধ করে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন—খুব ভালো কাজ করেছ বুড়ীমা। আমার অর্দ্ধেক কাজ ত' তুমিই করে দিয়েছ। নইলে আমাকে এই পাড়াগাঁয়ে মহাবিপদে পড়তে হতো। এত রক্ত কোথায় পেতাম?

ডাক্তারবাবুর হাঁকডাকে কয়েকজন কৃষকশ্রেণীর লোক এগিয়ে এলো। তারপর তারা ধরাধরি করে ওদের দু'জনকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন—ওহে মাঝি, এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসো। এখন নৌকোর মাঝিগিরি ছেড়ে আমার কম্পাউণ্ডার আর অ্যাসিস্টেণ্ট হতে হবে।

মাঝি বললে—ও কাজে আমি খুব রাজী! চলুন, কি কি আমায় করতে হবে দেখিয়ে দেবেন।

অপারেশনের ঘরে গিয়ে ডাক্তারবাবুর আর এক চেহারা।

দুইটি মরণাপন্ন রোগীর অপারেশন করতে হবে। বেশী দেরী করবার উপায় নেই! তা'হলেই প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠবে।

রোগীদের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবুর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

যেন এক মুহূর্তে পৃথিবী ভুলে গেলেন তিনি। সমস্ত যন্ত্রপাতি দ্রুতগতি যথাযথ ভাবে সাজিয়ে ফেললেন। তারপর নৌকোর মাঝির দিকে তাকিয়ে বললেন—অপারেশন-টেবিলের কাজ তোমায় মোটামুটি শিখিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে সাহায্য করো।

মাঝি বললে, 'আপনার কাছে ত 'ঘাটের মরা' নিয়ে কত বার যাতায়াত করতে হয় নি আমাকে। আপনি দয়া করে আমাকে ডাক্তারী শাস্ত্রের অনেক কিছুই শিখিয়ে দিয়েছেন।'

ডাক্তারবাবু গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন—এইবার তোমাকে সেই শিক্ষার পরীক্ষা দিতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করে নাও।

মাঝি বললে, 'সমরক্ষেত্রের সৈনিকের মতো আমি সব সময়েই প্রস্তুত।'

ক্ষিপ্রবেগে গুরু-শিষ্য কাজে লেগে গেল। আলো জ্বলছে মাথার ওপরে। ঘরের দরজা চারদিকে বন্ধ। গ্রামদেশে যতখানি ব্যবস্থা করা সম্ভব সে বিষয়ে ডাক্তারবাবু চেষ্টা করে কোনো ত্রুটি রাখেন নি।

ভোম্বল আর দুখ্‌নী এই দুইজনের ক্ষতই বিষাক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল।

ডাক্তারবাবুর অমানুষিক পরিশ্রমে আর সেই সঙ্গে'মাঝি'র আন্তরিক সহযোগিতায় পুরো চার ঘণ্টার পর দুই রোগীর অপারেশন-কার্য সমাধা হলো।

ডাক্তারবাবুর মুখে এইবার হাসি ফুটে উঠলো।

তাই দেখে নৌকোর মাঝি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। ডাক্তারবাবু তাঁর সহকারীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বুড়ী তাঁর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বললে—তুমি আমার ধর্মবাপ! এইবার বল তো বাবা, আমার ছেলেমেয়ে বাঁচবে কিনা?

ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—সকাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়ে নি। কেবলি ইঁদুরে ডন দিচ্ছে সেখানে। আগে দুই ধামা গুড়-মুড়ি নিয়ে আয় বুড়ীমা! তারপর অন্য কথা···হুঁ !!!

॥ চৌদ্দ ॥

ভোম্বল আর দুখ্‌নীর অপারেশনের পর সাতদিন কেটে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারবাবুর বাগানে ওদের সান্ধ্য মজলিশ বসেছে।

এত ছুটোছুটি আর কাজকর্মের ভেতরও এই বাগানটির দিকে ডাক্তারবাবুর দুটি চোখ সব সময় সজাগ। তারই ফলে নানা রকম ফুলের গাছে ছোট্ট বাগানটি সত্যি মনোরম।

ফুলের মধুর গন্ধ ভেসে আসছে মৃদু সমীরণে, আর ওরা কয়েকজনে বসে ডাক্তার-বাবুর মুখে মজার মজার গল্প শুনছে।

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ডাক্তারবাবুর। বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক।

পুরোনো দিনের সেই সব কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী তিনি বসিয়ে বসিয়ে বলছিলেন আর আপন মনে বসে শুনছিল নৌকোর মাঝি, ভোম্বল, দুখ্‌নীর মা আর দুখ্‌নী।

ওই ছোট্ট মেয়ে দুখ্‌নী এখানে এসে যেন এক নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছে। সেও ধীরে ধীরে দেশকে ভালোবাসতে শিখছে। তার ছোট্ট প্রাণে দেশপ্রেমের অঙ্কুর যেন ধীরে ধীরে আলো, মাটি আর হাওয়ায় বিকশিত হয়ে উঠতে চাইছে।

এক সময় ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এই রকম হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। অচেনা মানুষ—যারা জানে না, তারা আচম্‌কা সেই হুঙ্কার শুনে চমকে ওঠে।

দুখ্‌নীর মা শুধোলে—বেশ ত' গল্প হচ্ছিল, আবার বাঘের মতো ডাক ছাড়ছো কেন?

ডাক্তারবাবু তেমনি আর একটা ডাক ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা বুড়ী মা, তুমি এমন নেমকহারাম কেন?

বুড়ী হক্‌চকিয়ে গেল; জিজ্ঞেস করলে—কেন? কেন? কসুরটা কি হলো শুনি?

ডাক্তারবাবু কইলেন—অ্যাঁ, আবার বলছ কসুর হয় নি? তোমার ছেলে-মেয়েকে আমি ভালো করে দিলাম, আর তুমি আমায় একদিন খাওয়ালে না?

বুড়ী মার দুই চোখে জল! বললে, 'সবই ত' তোমারই খাচ্ছি বাবা! আমার মত গরীব-দুঃখী মা কি তোমারে খাওয়াতে পারে?'

ডাক্তারবাবুর আবার হুঙ্কার শোনা গেল—হু আমি কি সেই কথা বলেছি নাকি? আমি বলছি, বুড়ী মা নিজের হাতে আমাকে কিছু খাবার তৈরী করে খাওয়াবে।

বুড়ী মা বললে, 'দুখী মা তোমায় শাক রান্না করে খাওয়াতে পারে। আর কি পারে বেটা?'

এই সময়টায় ডাক্তারবাবুর গলা ভারী হয়ে এলো। তিনি বললেন, 'দেখ মা, ছেলেবেলায় আমার মা মুড়ির মোয়া আর নারকোল-নাড়ু তৈরী করে খাওয়াতো। সে খাবার ত' এখন ভুলেই গেছি। আমাকে তুমি তাই তৈরী করে খাওয়াও দেখি একদিন!

বুড়ী মা হাসতে হাসতে বললে, 'এ আর বেশী কথা কি? কালকেই আমার ছেলেদের মুড়ির মোয়া আর নারকোল-নাড়ু খাইয়ে দেবো।'

শুনে ডাক্তারবাবু আনন্দে মাথা দোলাতে লাগলেন।

খানিকটা চুপ করে থেকে তারপর তিনি বললেন, 'দেখ বুড়ীমা, সহরে যদি আমি চিকিৎসা করতাম, তা'হলে তোমার আশীর্বাদে আমি অনেক টাকা রোজগার করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি পারি নি।'

বুড়ী শুধোলে, 'কেন গো ? তোমার বাড়ি হতো, গাড়ি হতো,—ফটকে দারোয়ান থাকতো ! আর আমার মতো বুড়ী দেখলে বলতো—হট্ যাও, তফাৎ যাও !'

বুড়ীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু হাসতে লাগলেন। তারপর খানিক বাদে বললেন, 'সত্যি বুড়ী মা, সত্যি তাই। সহরের ডাক্তার হলে আমি তোমাদের কাছাকাছি আসতে পারতাম না। আমার বিপ্লবী ভাইদের চিনতাম না। তা ছাড়া—বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সনাতনবাবু এবং আমি ছিলাম সহপাঠী। একই সঙ্গে অমরা ডাক্তারী পাশ করে প্রতিজ্ঞা করি আমরা দেশের জন্য কাজ করবো। কিন্তু বন্ধু সনাতনের চোখ দু'টি একেবারে চলে যাওয়াতে সে আজ অন্ধ। তাই তার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। তা ছাড়াও আমার মায়ের আদেশ ছিল। আমার মা বার বার বলেছিলেন—আমি যেন গাঁয়ের লোকের দুঃখ দূর করি। মরবার সময়ও তাঁর মুখে একই কথা ছিল। তখনো আমি পুরোপুরি ডাক্তার হই নি। তবু আমার মায়ের আদেশ ছিল, ডাক্তার হয়ে আমি যেন গাঁয়ের লোকের দুঃখ দূর করি। সেই মায়ের হাতের মুড়ির মোয়া আর নারকোল-নাড়ু আমি আর খেতে পাই নে। বুড়ী মা আমাকে তাই খাওয়াবে বলেছে। আজ আমার আনন্দ হবে না ?

হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর একটা শিস্ শুনে ডাক্তারবাবু সচকিত হয়ে উঠলেন। নিজের চারপাশে একবার তাকালেন ; তারপর নিজেই একটা শিস্ দিয়ে উঠলেন।

ডাক্তারবাবুর কাণ্ড দেখে ভোম্বল ত' অবাক ! ডাক্তারবাবুর এ আবার কি নতুন খেলা সুরু হল ?

একটু বাদেই দেখা গেল, একটি নেপালী ছেলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে সেইখানে হাজির হল ; তারপর ডাক্তার বাদে আর সব অচেনা মুখগুলোর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বাহাদুর, এরা সব আমার দোস্ত আছে। এদের সামনে তুই সব কথাই খুলে বলতে পারিস্।'

সেই কথা শুনে বাহাদুরের কুতকুতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—হয়ত ও একবার মুচকি হাসলো ; তারপর চারদিকে তাকিয়ে বললে—টিকটিকি···

ওর কথা শুনে আর রকম-সকম দেখে ডাক্তারবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—এখানে আবার টিকটিকি কোথায় দেখতে পেলি বাহাদুর ?

বাহাদুর তার ছোট ছোট চোখ দুটোকে আরো ছোট করে উত্তর দিলে—টিকটিকি জানতে পেরেছে। আজ রাতে পাহারাওয়ালারা আসবে নৌকো করে। বাড়ি ঘেরাও করবে।

এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু সত্যি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এই ছিঁচকে টিকটিকিগুলো ত' সত্যি ভাবিয়ে তুললে। এখন এই সন্ধ্যেবেলাতেই কি করা যায় মাঝি ?

এই বলে তিনি তাঁর অপারেশন সহকারী নৌকোর মাঝির দিকে তাকালেন।

নেপালী ছোকরাটা খবরটা দিয়েই কোন ফাঁকে পালিয়ে গিয়েছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নি।

ডাক্তারবাবুর মুখচোখের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন বদলে গেল। কোথায় সেই হাসি-তামাসা ? কোথায় সেই মুড়ির মোয়া আর নারকেল-নাড়ু নিয়ে কৌতুক ?

ডাক্তারবাবু বাগানের মধ্যেই পায়চারী সুরু করে দিলেন। দুটি হাত পেছন দিকে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে যেন সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছে! কপালের চিন্তারেখাগুলো যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভোম্বলরা অবাক হয়ে যেন এক নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখতে লাগলো!

হঠাৎ ডাক্তারবাবু হাতদুটোকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। তারপর বাঁ হাতের চেটোর ওপর ডান হাতের মুঠি দিয়ে একটা আঘাত করে বললেন—ঠিক হয়েছে—আর ভয় নেই!

নৌকোর মাঝি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছেডাক্তারবাবু ? ব্যাপারটা কি ?

ডাক্তারবাবু বিরক্তির সুরে উত্তর দিলেন—ছিঁচকে টিকটিকিরা পেছনে লেগেছে। আজই নাকি পুলিশের দল আমার বাড়ি ঘেরাও করবে। কিন্তু আমাকে সহজে কাবু করতে পারবে না বাছাধনেরা! তারা যদি ঘোরে ডালে ডালে, তবে আমি ফিরি পাতায় পাতায়—হুঁ হুঁ বাব্বা!

ডাক্তারবাবু আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর নৌকোর মাঝি আর ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আর দেরী নয়। এক্ষুনি তৈরী হয়ে যেতে হবে তোদের।

ওরা দু'জনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় ?

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন—আমার মেয়ের বাড়ি। খালের পথ দিয়ে সেখানে পৌঁছুবার একটা সোজা রাস্তা আছে। তোদের এক্ষুনি নারকোলের মহাজন তৈরী করে দিচ্ছি। ঘাটে আমার নারকোল-ভর্তি নৌকো আছে। তাতে চেপে তোরা চটপট রওনা হয়ে পড়।

ডাক্তারবাবু ওদের অপারেশন ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর নিজের হাতে ওদের সাজিয়ে দিলেন। বললেন—তোরা গাঁয়ে গাঁয়ে নারকোল বিক্রি করিস্, বুঝলি? পুলিশের কোনো নৌকো যদি রাস্তায় ধরে, তা'হলে সোজাসুজি এই কথা বলে দিবি।

সত্যি, ঘাটে নারকোল-বোঝাই নৌকো ছিল। ডাক্তারবাবুর বাগান থেকেই এসেছে। এখন সেই নৌকো কাজে লেগে গেল।

ডাক্তারবাবু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর আপন মনেই বললেন—হুঁ হুঁ! কেমন জব্দ করলাম ব্যাটাদের। এখন রাত্তির বেলা বাড়ি ঘেরাও করে দেখবি—পাখী পালিয়েছে।

ডাক্তারবাবু মেয়ের নামে একটা চিঠি লিখে দিলেন।

নারকোল-বোঝাই নৌকো এগিয়ে চললো খাল ধরে।

দু'পাশে বড় বড় উঁচু উঁচু গাছ। সেই সব গাছের ছায়া পড়েছে খালের জলে।

কাজেই মনের আনন্দে ওরা এগিয়ে চলেছে। মাঝি একটা ভাটিয়ালি গান ধরলে।

সেই গানের মধুর সুর সন্ধ্যেবেলার হাল্‌কা হাওয়ায় যেন দুই পাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

প্রায় শেষ রাত্তিরে ওদের নারকোল-বোঝাই নৌকো ডাক্তারবাবুর মেয়ের খিড়কীর পুকুরে গিয়ে হাজির হল।

তাদের কি করতে হবে ডাক্তারবাবু সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

নৌকোর মাঝি ধীরে ধীরে নেমে বাড়ির উঠোনের ধানের গোলার পাশ দিয়ে একটা ঘরের জানালায় টক্-টক্ করে শব্দ করলো।

শব্দ করবার আগে মাঝি দেখে নিলে জানালার সামনে একটা জামগাছ আছে কিনা!

ডাক্তারবাবুর মেয়ের ঘুম খুব পাতলা। এই জাতীয় ঘটনা তার বাড়িতে আরো ঘটেছে। কাজেই কোনো কিছুই তার অজানা নয়। উপযুক্ত বাপের কাছে শিক্ষা পেয়ে উপযুক্ত মেয়েই সে হয়েছে। তাই বহু বিপ্লবী বিপদে-আপদে এইখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার রাত কাটিয়ে অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু এই দলটি শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্যই আসেনি। কয়েকদিন এখানে বাড়ির লোকের মতো বসবাস করবে। ডাক্তারবাবুর চিঠিতে মেয়ের কাছে সেই নির্দ্দেশই ছিল।

ডাক্তারবাবুর মেয়ে সুরমা সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে দিলে। দুখ্‌নীর মা হল

—সুরমার দিদিমা। নৌকোর মাঝি আর ভোম্বল ওরা দুই মামা। আর দুখ্‌নী ওদের আশ্রিতা মেয়ে। এই পরিচয়ে ওরা আশ্রয় পেলে।

সুরমা ওদের কানে কানে যে কথা জানিয়ে দিলে, সেটাও কম চমকপ্রদ নয়!

ডাক্তারবাবুর মেয়ে গোপন দেশ-সেবিকা; কিন্তু ও দেশ-সেবিকা হলে কি হবে, তার স্বামী কিন্তু পুলিশের লোক!

স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করে চলে। তাতে অবশ্য উভয়ের কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

এও যেন এক লুকোচুরি খেলা।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। কাজেই ভয়ের কিছু ছিল না।

ওরা কয়েক দিনের মধ্যে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল!

দুখ্‌নীর মা কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথা ভোলেনি। সুরমার বাড়িতে বসেই মুড়ির মোয়া আর নারকোলের নাড়ু তৈরী করে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলে। যে লোকটি নিয়ে গিয়েছিল সে সুরমার বিশেষ বিশ্বাসী লোক। সে ফিরে এসে জানালে, ওই দিন রাত্রে পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করেছিল; কিন্তু কাউকে না পেয়ে মুখ চূণ করে পালিয়ে যাবার পথ পায় নি।

সেই খবর শুনে নৌকোর মাঝি, ভোম্বল, দুখ্‌নীর মা আর দুখ্‌নীর কি হাসি!

দিন কয়েক বাদে বাড়ির কর্তার এক খুড়তুতো ভাই এসে হাজির হল। সুরমার কাছে কি এক চিঠি নিয়ে এসেছে। সে কিছুদিন এইখানে থাকবে। ছেলেটি দুই দিনের মধ্যেই ভোম্বলের খুব বন্ধু হয়ে উঠলো। ছেলেটির নাম অনন্ত। যে ভারী চমৎকার ছবি আঁকতে পারে।

খালের ধারে, ধানের মড়াইয়ের পাশে, নদীর কিনারায় আর আম-বাগানের আশে পাশে ঘুরে সে অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেললো।

ভোম্বল বললে, 'আমায় ছবি আঁকা শেখাবে অনন্ত?'

অনন্ত ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, 'নিশ্চয়। তুমি যে আমার বন্ধু হয়ে পড়েছ!'

একদিন অনন্ত ভোম্বলকে একটা পোড়ো বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল। বললে—তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।

—কি গোপন কথা?

—শোনো ভোম্বল, আমি তোমাদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছি। আমি এই বাড়ির কর্তার ভাই নই, তাঁর চর। তোমাদের ওপর নজর রাখতে আমায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমায় ভালোবেসে আমি দেশকে ভালোবাসতে শিখছি। তাই আর মিথ্যাচার করতে পারবো না। এখান থেকে পালাও—নইলে সামনে সমূহ বিপদ!

॥ পনেরো ॥

শেষ পর্য্যন্ত ভোম্বল পালানোই ঠিক করলো। সবাইকার সঙ্গে জড়িয়ে ও যদি এখানে থাকে তবে সকলকেই সে বিপদের মধ্যে ফেলবে। এমন কি ডাক্তারবাবুর মেয়েও বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

তার চাইতে নিঃশব্দে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ওরা হয়ত পালানোর আসল কারণটা বুঝতে পারবে না, ওকে অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ ভেবে গালাগাল দেবে, কিংবা ওদের পক্ষে আর কিছু ভাবাও বিচিত্র নয়।

তবু ভোম্বল মনস্থির করে ফেললে।

রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে—ঠিক তখন পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভোম্বল একবার ভাবলে, ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে একটা চিঠি লিখে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলে, কোনো প্রমাণ কিংবা নিদর্শন রেখে যাওয়া কোনো ক্রমেই উচিত হবে না।

হঠাৎ যদি গোয়েন্দার দল খানাতল্লাসী করে তা'হলে এই চিঠি ডাক্তারবাবুর মেয়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। বিপ্লবীদের সঙ্গে যে তার যোগাযোগ আছে—সে-কথাও ভালো করেই প্রমাণিত হবে।

সুতরাং সে সঙ্কল্পও ভোম্বল মন থেকে মুছে দিল।

দুখ্‌নী এসে জিজ্ঞেস করলে, 'ভোম্বলদা, এতো ভাবছ কেনে ?'

ভোম্বল জবাব দিলে—আরে তোর কথাই ত ভাবছি। তোর পা-টা একেবারে সেরে গেছে ত' ?

দুখ্‌নী তার হাত নেড়ে, চুল দুলিয়ে পাকা বুড়ীর মতো বললে, 'সে ত' কবে ভালো হয়ে গেছে ভোম্বলদা ! এখন আমাদের বাড়ী ফিরে গেলেই হবেক।'

ভোম্বল জবাব দিলে—এত ব্যস্ত কিসের জন্য ? আগে ডাক্তারবাবু এসে তোকে দেখে যাবেন। তারপর তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

দুখ্‌নী চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'ভোম্বলদা, ইখানে আর ভালো লাগছেক নেই। মাও বলতিছে—

ভোম্বল মিটিমিটি হেসে বললে, 'কি বলছেক মা ?,

দুখ্‌নী উত্তর দিলে—আর কতকাল ইখানে থাকবেক। বাড়ি চলি গেলে হবেক।

ভোম্বল জবাব দিলে—তোদের কোনো ভাবনা নেই দুখ্‌নী। একবার ডাক্তারবাবু এসে পড়লে হয়। তিনি পরীক্ষা করে ছুটি দিলে একেবারে সোজা দেশে চলে যাবি।

দুখ্‌নীও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—ভোম্বলদা, তুমি মোদের সাথে যাবেক ত ?

—সে তখন দেখা যাবে !

ভোম্বল পাশ কাটিয়ে গেল দুখ্‌নীর প্রশ্নটার।

হঠাৎ ভোম্বল জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আচ্ছা দুখ্‌নী ,তুই কি খেতে ভালবাসিস্‌ ?

দুখ্‌নী মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে—ঢ্যাপের মোয়া খেতে খুব ভালো লাগবেক।

ভোম্বল হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোকে ঢ্যাপের মোয়া খাওয়াবো, কথা দিচ্ছি।

ভোম্বল জানতো' বাগ্‌দীপাড়ায় চ্যাপের মোয়া পাওয়া যায়।

কাজেই সে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিকেলের দিকে বাগ্‌দীপাড়ায় চলে গেল।

বাগ্‌দীর বৌরা বেতের ঝুড়ি, বাঁশের চুবড়ী এই সব জিনিস তৈরী করে হাটে-বাজারে বিক্রি করে। ভোম্বলের সঙ্গে ওদের খুব ভাব। সে কত দিন এই পাড়ায় এসে ওদের হাতের কাজ দেখে গেছে। ঢ্যাপের মোয়া যোগাড় করা আর শক্ত কাজ কি ? ঢ্যাপের মোয়া চাইতেই ওরা ওদের কালো হাঁড়ি থেকে বের করে দিলে কয়েকটা।

রাত ক্রমে গভীর হল। বাড়িশুদ্ধু সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূরে অশথগাছের ডালে একটা ভূত-ভূতুম পাখী কেবলই ডেকে চলেছে। কিন্তু পাখীর ডাক শুনে ভয় পাবার ছেলে ভোম্বল নয়।

দুখ্‌নীর শিয়রে ঢ্যাপের মোয়াগুলো গুছিয়ে রেখে পা টিপে টিপে ভোম্বল বাইরে বেরিয়ে এল। একবার সে মনে করলো, সোজা বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ চলে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলে, জীবনদার অনুমতি না নিয়ে বাবুইবাসা বোর্ডিংএ যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ বর্তমানে ওখানকার অবস্থা তেমন কিছুই জানা নেই।

হয়ত এমনও হতে পারে যে, পুলিশের কড়া নজর রয়েছে বোর্ডিং-এর ওপর। কিন্তু প্রমাণের অভাবে পুলিশ কিছুই করতে পারছে না।

সেক্ষেত্রে হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে অবস্থাটাকে জটিল করে তুলবে-কেন ?

থম্‌কে দাঁড়ালো ভোম্বল।

কিন্তু ওই গাছের ছায়ায় মূর্তিমান প্রেতের মতো কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ? পুলিশের লোক নয় ত ?

হয়ত তারই খোঁজে গোপনে এ বাড়িতে এসেছে !

তখন এগুবে কি পেছুবে—ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না ভোম্বল। এমন সময় একটি পচিচিত গলা শোনা গেল—এগিয়ে আয় এদিকে।

এ কি ! এ যে জীবদার কণ্ঠস্বর।

একেবারে যাকে বলে মেঘ না চাইতেই জল।

প্রবল পুলকে ছুটে গেল ভোম্বল, তারপর জীবনদাকে জড়িয়ে ধরে আবেগভরা গলায় বললে, 'জীবনদা, আপনি !!'

জীবনদা ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—চুপ, চ্যাঁচাস্ নে। তোকে নিয়ে যেতেই আজ রাত্রে আমি এখানে এসেছি। দেখিস্—কেউ যেন জেগে না ওঠে।

ভোম্বল বললে, 'না, না, সবাই ঘুমিয়ে আছে। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তাই আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছিলাম।'

জীবনদা জবাব দিলেন—যাক, ভালোই হল। তোকে আর ডাকাডাকি করতে হল না। এখন চল আমার সঙ্গে।

—কোথায় জীবনদা ?

—তোর ওপর এক শক্ত কাজের ভার পড়েছে। আর তাই আমি তোকে নিতে এসেছি। এখানে আর কোনো কথা নয়। ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। সোজা আমার সঙ্গে চলে আয়। যেতে যেতে সব কথা জানিয়ে দেবো।

দুইজনে নিঃশব্দে রওনা হল।

ভোম্বল একবার শুধু পেছন ফিরে তাকালো। গোটা বাড়িটাই নীরব নিঝুম। সারাদিনের খাটা-খাট্‌নীর পর সকলেই ঘুমুচ্ছে।

ওপরে আকাশের দিকে তাকালে ভোম্বল।

সেখানে কালপুরুষ নীরবে প্রহর গণনা করছে। আরো অসংখ্য তারা সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে। তারাগুলো যেন চোখ পিট্‌পিট্ করে এই দুটি পলাতক মানুষকে দেখে নিলে।

অনেকগুলো 'ব' মেলে দিয়েছে একটি বুড়ো বটগাছ। সেইগুলো আঁকড়ে ধরে জীবনদার পেছন পেছন ভোম্বল নীচে নৌকোতে নেমে এল।

অন্যান্য বারের মতো একটি মাঝি চুপচাপ বসে আছে সেই নৌকোতে। ভোম্বল বুঝতে পারলে, মাঝিও একজন নামকরা বিপ্লবী। সে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে না।

ওরা দু'জনে নৌকোয় ওঠা মাত্র মাঝি খালের পথে নৌকো চালিয়ে দিলে।

ঘণ্টা খানেক চলবার পর সেই নৌকো নদীতে এসে পড়লো।

জীবনদা এইবার জিজ্ঞেস করলেন—ভোম্বল ঘুমুলি ?

জীবনদা পাটাতনের ওপর শুয়ে তারাদলের ওপর দিয়ে মেঘের আনাগোনা দেখছিলেন।

এই মাত্র একটি উল্কা ছুটে গেল—দূর আকাশের কোণে।

জীবনদার প্রশ্নের উত্তরে ভোম্বল বললে, 'না, জীবনদা, ঘুম আসছে না।'

জীবনদা বললেন, 'তা'হলে এই ফাঁকে কাজের কথাটা শুনে রাখ।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বেশ কিছুটা বাদে জীবনদা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আজই শেষরাত্রে আমাদের এক বিপ্লবী বন্ধুর ফাঁসি হবে।

—অ্যাঁ ফাঁসি!

চমকে উঠলো ভোম্বল।

জীবনদা জবাব দিলেন—এতে চম্‌কাবার কিছু নেই। আমাদের পথ যে ফুলে ঢাকা পথ নয়—তা ত' তোরা সবাই জানিস।

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।'

তাই আমরা গোপন বৈঠকে স্থির করেছি—একটি মানুষের বদলে আর একটি মানুষকে সরে যেতে হবে।

নৌকোর মাঝি আর ভোম্বল কোনো জবাব দিলে না।

জীবনদা আপন মনে বলে চললেন—এই ফাঁসি হবে ভোররাত্রে, আর সাহেবদের বিজয়-উৎসব হবে সারা রাত। এই বিজয়-উৎসবেই মা কালীর নামে আমাদের বলি নিবেদন করতে হবে।

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'কাজের দায়িত্ব কি আমার ওপরেই পড়েছে?'

জীবনদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

তারপর আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

জীবনদাই আবার সেই নীরবতা ভেঙে বললেন, 'বাঘ মানুষের রক্ত খায়; কিন্তু বাঘেরও ত' প্রাণের ভয় আছে? তাই ওরা গভীর বনে বাস করে।'

আজ রাত্রে যে রক্তলোলুপ সাহেবের দল বিজয়-উৎসব করবে। তারা একটি নির্জ্জন বাংলো-বাড়ি নির্ব্বাচন করেছে। বাইরের সভ্য-জগৎ যেন এই আনন্দলোকের কোনো খবর জানতে না পারে। কিন্তু খবর গোপন করতে চাইলেই কি গোপন করা যায়?

ওদের যেমন গোয়েন্দা বাহিনী আছে—বিপ্লবীদেরও তেমনি আছে শিক্ষিত গুপ্তচরের দল। তারা সব সময় সব খবর এনে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। তাই আমরা আগের থেকে সব খবরই জানতে পেরেছি। ভোররাত্রে আমাদের এক বিপ্লবী বন্ধু ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাবে, আর রাত্রিবেলা নেক্‌ড়ে বাঘের দলের হবে বিজয়-উৎসব!

সংহাররূপিণী ভয়ঙ্করী করালী কালী আজ জেগেছে; চীৎকার করে বলছে—'ময় ভুখা হুঁ'।

মায়ের সেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু খুব গোপনে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিজয়-উৎসবকে রক্তসন্ধ্যায় রূপান্তরিত করতে হবে।

ধীরকণ্ঠে ভোম্বল বললে, 'আমি প্রস্তুত জীবনদা !'

জীবনদা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সারাদিন ধরে আমরা নৌকোতেই কাটাবো। দুপুরবেলা এক জায়গায় নৌকো লাগিয়ে খাওয়া দাওয়া সারবো। তারপর চলবে মহাবলির প্রস্তুতি-পর্ব !'

দুপুরবেলা একটা গঞ্জে নৌকো লাগিয়ে নৌকোর মাঝি ওপরে উঠে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে কিছু খাবার ও একটি কাগজ নিয়ে ফিরে এলো। এই গঞ্জে বিপ্লবীদের একটি গোপন ঘাঁটি আছে। এই ঘাঁটির বিপ্লবীরা আগে থেকে খবর পেয়ে ওদের জন্যু খাবার তৈরী করে রেখেছিল।

জীবনদা সকলের আগে কাগজটা খুলে ফেললেন। বিপ্লবীর ফটো আর তার ফাঁসি হবার খবরটা জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠলো তিনটি বিপ্লবীর চোখে !

ভোম্বল তাকিয়ে দেখলে, জীবনদার দুই চোখ ভর্তি জল টল্‌টল্ করছে।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাঁর মনকে শক্ত করে তুললেন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কিছুকাল নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর নৌকোর পাটাতনের ওপর একটা ঘুসি মেরে বললেন—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই কালী করালী বলি চায় !!

গভীর রাতে ভোম্বল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটি নির্জন বাংলো,বাড়ী। ভেতরে আলোর ঝিলিক্।

দলে দলে সাহেব আর মেমসাহেবরা নাচছে।

ইংরাজী বাদ্য বাজছে।

বেয়ারার দল ঘন ঘন খাদ্য আর পানীয় পরিবেশন করছে।

জীবনদা জানিয়ে দিয়েছেন, যে সাহেবের বুক-পকেট থেকে লাল রুমাল উঁকি দিচ্ছে—তাকেই বলি দিতে হবে।

রাত যত গভীর হচ্ছে সাহেবদের নাচ তত জমে উঠছে।

ভোম্বল একটি জানালার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সুযোগ পেয়ে এক ঝাঁক মশা ওর দুটি পায়ের রক্ত যেন শুষে নিচ্ছে।

আশে-পাশে একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। ডোবা থেকে ভেসে আসছে গ্যাঙোর-গ্যাঙ শব্দ।

হঠাৎ একটা ঝোপের ভেতর থেকে শঙ্খের শব্দ শোনা গেল।

ভোম্বল নিজেকে তৈরি করে নিল।

যেই সাহেবটা নাচতে নাচতে জানালার ধারে এসেছে, অমনি বোমা ফাটার শব্দে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বল ঝাঁপিয়ে পড়লো খালের জলে।

॥ ষোল ॥

প্রথমে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে চলেছিল ভোম্বল।

একবার ভাবলে—অন্ধকার রাত। এ ভাবে খালের জলে অসহায় ভাবে সাঁতার কাটা কি ঠিক হবে? পথঘাট কিছুই জানা নেই। এই খাল কোন্ দিকে কোন্ অঞ্চলে গেছে তাও সে জানে না। আবার ভাবলে, ঘটনাস্থল থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই ভালো।

কেননা নিশীথ রাতের ওই অভিযানের পর চারদিকে একটা সোরগোল পড়ে যাবে। তখন আততায়ীর সন্ধান করতেও ওরা কসুর করবে না।

সাঁতারু বলে ভোম্বলের একটা নাম আছে। কাজেই ও ঠিক করলে,—আসল ঘটনার জায়গা থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

এই ভেবে সে দুই হাত বৈঠার মতো চালাতে লাগলো।

প্রাণপণে এগিয়ে চলেছিল ভোম্বল।

মাঝে মাঝে খালধারের ঝোপ-জঙ্গলের সঙ্গে ওর কাপড় আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু তা ও মোটেই গ্রাহ্য করে নি।

দু'ধারের পাড় ভেঙে ষ্টিম-লঞ্চ যেন ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে।

আরো কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর দেখা গেল খালটা বেশ চওড়া হয়ে গেছে। তখন ভোম্বলের একটু হাত-পা খেলিয়ে সাঁতার কাটবার সুবিধে হলো।

বর্ষার জলে খালটা এখানে টইটুম্বুর, স্রোতেরও এখানে বেশ টান আছে।

সাঁতার কাটতে কাটতে ভোম্বলের মনে হলো কাছেই নদী, আর খালটা গিয়ে সেই নদীতে পড়েছে। নিশ্চিন্ত আরামে এইবার ভোম্বল চিৎ-সাঁতার কাটতে লাগলো।

হঠাৎ ওর মনে হলো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে কিসে যেন কামড়ালে। তীব্র তার যন্ত্রণা। সাপ-টাপ নয় ত? এই অন্ধকারের মধ্যে কিসে যে হঠাৎ কামড়ে দিল সেটা বুঝবার কোনো উপায় নেই। কোথায় টর্চ—কোথায় লণ্ঠন—কে দেখবে?

আকাশে অনেক উঁচুতে তারাগুলো টিম-টিম করে জ্বলছে। কিন্তু ওগুলো শুধু চোখেই পড়ে। ওদের আলোতে কিছু দেখবার যো নেই।

কামড়ের জায়গাটায় তীব্র বেদনা বোধ করতে লাগলো ভোম্বল।

এ কি! ওর সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করছে কেন? তবে কি সত্যি সাপের কামড়?

অবশ্য জলে এই সময় ঢোড়া সাপেরা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যদি সত্যি কোনো বিষধর সাপে কামড়ে থাকে, তা'হলে উপায় ?

ওর দেহটা যেন সত্যি অবশ হয়ে আসছে। দুই হাতে আর বল পাচ্ছে না। কি করে সাঁতরে এগিয়ে যাবে ?

হঠাৎ দেখতে পেলে—তার পাশ দিয়েই একটা ভেলা ভেসে যাচ্ছে। প্রাণপণ শক্তিতে সেই ভেলার একটা কলাগাছ ভোম্বল আঁকড়ে ধরলে।

তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

স্রোতের টানে সেই ভেলা কিন্তু ভেসে চললো সিধে নদীর দিকে। নদীতে পড়ে ভেলা এগিয়ে চললো দক্ষিণমুখো—শাঁ-শাঁ করে।

ভোম্বল সেই যে ভেলার কলাগাছটা আঁকড়ে ধরেছিল, সেটা আর ছাড়ে নি! তারপর কখন সে তীব্র বিষের জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে-কথা নিজে বুঝতেও পারে নি।

ভোরের দিকে ভাসতে ভাসতে সেই ভেলাটা একটা গঞ্জের কাছে গিয়ে আটকে গেল।

প্রথমে নৌকোর মাঝিরা ওকে দেখতে পায়। তাই ত'—একটা অচৈতন্য মানুষ এখানে কোথা থেকে ভেসে এলো ?

একজন দুইজন করে গঞ্জের ঘাটে ভীড় জমে গেল।

অনেক গুণী মানুষও ত' গঞ্জে-হাটে আনাগোনা করে। তাদের একজনের চোখে ধরা পড়লো অচৈতন্য ভোম্বলের দেহটা।

সে এগিয়ে এসে নাড়ি টিপে, চোখের পাতা উল্টে বললে—এ যে সাপে কাটা মানুষ। এখনো সময় আছে। আমি ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি।

গুণী আজগর সর্দারকে তখন অনেকেই চিনতে পারলো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মস্তবড় ওঝা—নাম আজগর সর্দার। একেবারে মরা মানুষকে যেন জ্যান্ত করে দেয় সে।

জন কয়েক লোক তখন আজগর সর্দারকে ধরলে—নিশ্চয়ই ছেলেটার পরমায়ু আছে। নইলে হঠাৎ তোমার চোখে পড়ে যাবে কেন ?

জনতা ঘাড় নেড়ে বললে, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

আজগর সর্দার বললে, 'তা হলে কিছু সরষে নিয়ে এসো, তিল তেল নিয়ে এসো। ···আর একটা গাছের নাম বলে দিয়ে বললে, 'তার ডাল ভেঙে নিয়ে এসো।'

ঘাটের মাঝিরাই সব যোগাড় করে দিলে।'

গঞ্জে উৎসাহী লোকের তখন অভাব নেই। যারা দাঁতন করতে করতে মজা দেখছিল, তাদের মধ্যেই দু'জন পাশের জঙ্গলে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলো।

তখন সুরু হল আজগর সর্দারের খেল। কখনো বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ছে, কখনো অচৈতন্য দেহটার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার পর-মুহূর্তেই গাছের ডালটা দিয়ে দেহটা সপাৎ-সপাৎ করে পিটছে। হঠাৎ আজগর সর্দার বলে বসলো—পাঁচটি মুরগীর ছানা চাই।

গঞ্জে সব রকম মানুষই হাজির ছিল। তাদের একজনের মুরগীর ঝুড়িতে পাঁচটি মুরগীর ছানা খুঁজে পাওয়া গেল।

আজগর সর্দার এক-একটা মুরগীর ছানার পেছনের অংশটা খানিকটা কেটে ভোম্বলের পায়ের ক্ষতস্থানে চেপে ধরে। মুরগীর ছানাটা বিষের জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। তারপর সেটা ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে।

এই ভাবে পাঁচটি ছানা যখন বিষের জ্বালায় মরে গেল, তখন আজগর সর্দার জনতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'খবরর্দার, এই মুরগীর বাচ্চা যেন কেউ খেতে যেও না। বাচ্চাগুলো সাপের বিষ টেনে নিয়েছে। যে ওগুলো খাবে সে নির্ঘাৎ সাপের বিষে মারা যাবে।

একজন জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা সর্দার, ছেলেটা বেঁচে উঠবে ত' ?'

এইবার আজগর সর্দার গর্বের হাসিতে হেসে উঠলো ; বললে, 'না-ই যদি বাঁচবে তবে আজগর সর্দার হাত লাগিয়েছে কেন ? বিষহরি মা মনসার দোয়া, চ্যাংড়াটা এবারের মতো সত্যি প্রাণডা ফিরে পেলো।

বলতে বলতেই সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, ছোঁড়াটা সত্যি চোখ খুলেছে।

জনতা তখন আজগর সর্দারের জয়ধ্বনি করে উঠলো।

যে ছেলে দুটো দাঁতন করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে গাছের ডাল এনে দিয়েছিল, এইবার তারা এগিয়ে এলো। বললে, 'সর্দার, তুমি ত' মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে পারো। বিদ্যেটা আমাদের শিখিয়ে দাও না।'

আজগর সর্দার দুই কান আঙুল দিয়ে চেপে ধরে উত্তর দিলে—তোবা, তোবা—ও কথা বলতে নেই।

কেন সর্দার, বলতে নেই কেন ?

আজগর সর্দারের মুখে তখন গর্বের হাসি।

ফিস্-ফিস্ করে উত্তর দিলে—গুরুর নিষেধ আছে। মন্ত্র কাউকে শিখিয়ে দিলে তার গুণ একদম বরবাদ হয়ে যায়। তোমরা জোয়ান আদমী—সে-সব কথা জানবে কি করে ? ত্রিশ বছর গুরুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তবে আমি এই মানুষ জ্যান্ত করার বিদ্যে জেনেছি।

ইতিমধ্যে ছেলেটা উঠে বসেছে।

আজগর সর্দার বললে, 'একবাটি গরম দুধ খাইয়ে দিতে হবে যে। কার কাছে পাওয়া যাবে একবাটি গরম দুধ ?'

নৌকোর মাঝিরাই এগিয়ে এলো এই কাজে। খাল-বিল-নদীপথে ওদের যাওয়া আসা। সাপে কাটা মরা ওরা অনেক দেখেছে। তাই অভিজ্ঞতা ওদের সাধারণ লোকের চাইতে অনেক বেশী।

কার নৌকোতে যেন দুধ ছিল ; তোলা উনুনে গরম করে গেলাস ভর্তি করে নিয়ে এলো।

আজগর সর্দার সেই দুধ নিয়ে ধীরে ধীরে ভোম্বলকে খাইয়ে দিতে লাগলো।

আস্তে আস্তে ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠলো ; বোকার মতো ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চারদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলো সে—আমি কোথায় ?

আজগর সর্দার হো-হো করে হেসে উঠলো এইবার। সকালবেলাকার নদীর হাওয়ায় তার সাদা দাড়ি নিশানের মতো পত্‌পত করে উড়তে লাগলো।

আজগর আজ খুশীতে ডগমগ। সেই কোন যুগে ওর গুরু বলে দিয়েছে, যেদিন একটি সাপে কাটা মরাকে সে জ্যান্ত করতে পারবে সেদিন পুণ্যির খাতায় মোটা অঙ্ক জমা পড়বে।

ওর মন্ত্র যে ব্যর্থ হয় নি তাতেই ওর আনন্দ। তাই বললে—তুমি ঠিক জায়গায় আছ বাচ্চা। এখানে এসে না আট্‌কালে এতক্ষণ দরিয়া তোমায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

ঘাটের মাঝিরা সায় দিয়ে বললে, 'সে-কথা সত্যি সর্দার !'

উৎসাহী লোকেরা ততক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে যে ছোকরাকে সাপে কামড়েছিল, সে ভেলা ধরে ভেসে যাচ্ছিল—ভাগ্যিস এই গঞ্জে এসে আটকে গিয়েছিল, তাই ত' আজগর সর্দার বিষ কাটিয়ে ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আজগর সর্দার জিজ্ঞেস করলে, 'তোর ঘর কোথায় বাচ্চা ? কোথা যাবি তুই ?'

ভোম্বল কি উত্তর দিল কিছুই বোঝা গেল না।

আগের রাত্তিরের ঘটনাটা তার চোখে ঠিক ছায়া-ছবির মতো ভেসে উঠলো !

সেই সাহেব-মেমদের নাচ-গানের জলসা, হুল্লোড়, খানাপিনা, আলোর ঝিলিক—

সে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে—মিশ্‌কালো আঁধার রাতে গা ঢেকে।

তারপর সেই বোমা ফাটার শব্দ। মুহূর্ত মধ্যে সে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খাল দিয়ে সাঁতার কেটে আসছিল, হঠাৎ কিসে যেন পায়ে কামড়ালো।

ধীরে ধীরে ওর শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো—ও নেতিয়ে পড়লো, তারপর একটা ভেলাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলো বুঝি!

আর কিছু মনে নেই।

কিন্তু ভোম্বল বেশীক্ষণ জনতার মধ্যে থাকতে চায় না!

বিপদ যে কোন্ দিক থেকে আসে কে বলতে পারে? ক্ষীণকণ্ঠে বললে সে—তা'হলে আমি চলি?

অনেকে বললে—এখন ত' তুমি হাঁটতে পারবে না। কাছাকাছি কোনো নৌকোয় উঠে আরাম করো—বিশ্রাম নাও। শরীরে জোর হলে তবে যাবে।

ঘাটের মাঝিরাও সেই কথায় সায় দিলে।

এমন সময় এক বুড়ো আর বুড়ি সেই গঞ্জের ঘাটে এসে হাজির।

বুড়ো-বুড়ী বললে, 'দেখি দেখি, আমরা আগে দেখে নি!

সবাই পথ ছেড়ে দিলে। এরা দু'জন আবার কে?

ভোম্বলকে দেখে বুড়ী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই ত' আমার কাতু···

বুড়ো চোখে ভালো দেখতে পায় না। হাত দুটো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এদ্দিনে ফিরে এলি কাতু?'

কাতু? এই বুড়ো-বুড়ীর হারানো ছেলে বুঝি?

জনতার চোখে-মুখে বিস্ময়!

ভোম্বল ধীরে ধীরে জবাব দিলে—কিন্তু আমি ত' কাতু নই, আমার অন্য নাম।

বুড়ী হাউ-হাউ করে আবার কেঁদে উঠলো—এমন করে লুকোলে কি হবে? তুই আমাদের সেই হারানো কাতু। পাঁচ বছর আগে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলি।

জনতার চোখে-মুখে নতুন বিস্ময়! মরা ছেলে জ্যান্ত হল,—আবার মা-বাবাকেও ফিরে পেলো।

আজগর সর্দ্দার একবার ওপর দিকে হাত তুলে বললে, 'খোদা কা মর্জি।'

কিন্তু মুস্কিলে পড়লো ভোম্বল। সেই গাঁই-গুঁই করে আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আপনারা ভুল করছেন। আমি কাতু নই—আমি—'

নাম বলতে গিয়ে থেমে গেল ভোম্বল।

কিন্তু বুড়ী না-ছোড়-বান্দা; বললে, 'তুই আমার কাতু নোস্? কিন্তু চিবুকের

নীচে ওই যে তিল! ওটা তোর জন্মতিল। ওরে তুই মায়ের চোখকে ফাঁকি দিবি?

বুড়ো বললে, 'না হয় পিঠই বেঁকে গেছে, চোখেই না হয় ছানি পড়েছে,—তাই বলে নিজের ছেলেকে আমি চিনতে পারবো না? ওঠ—চল আমাদের সঙ্গে।

আজগর সর্দ্দার বললে, 'খোদা মেহেরবান্!'

॥ সভেরো ॥

ভোম্বলের তখন শরীরের অবস্থা এমন নয় যে, বুড়ো-বুড়ীর কথার জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করে। তাই সে ভাবলে, এই সাপের কামড়ের পর তার প্রাণ যখন আবার ফিরে পেয়েছে তখন ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, সে অল্প-বয়েসেই মারা যায়।

হয়ত এই পৃথিবীতে তার করবার জন্য অনেক কাজ আছে।

কিন্তু কি সে কাজ ভোম্বল জানে না!

এক লহমার ভেতর অনেক কিছু ভেবে নিল সে।

এই অজানা-অচেনা অঞ্চলে তার একটা আশ্রয়ের একান্ত দরকার।

বিশেষ করে শরীর যেমন ঝিমিয়ে আছে, মাথা যে রকম ভারী বোধ হচ্ছে, আর পা যে ভাবে টলছে তাতে দু'চার দিন ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে।

আরো একটা কথা হচ্ছে। যে কাজ সে করে এসেছে, তাতে কয়েক দিন লুকিয়ে থাকাই দরকার। বিপদ কখন কোন্ দিক দিয়ে আসে, তা কেউ বলতে পারে না।

কাজেই ভোম্বল যদি এখন একটা আশ্রয় পায়, তা'হলে তার ভালোই হবে!

ভোম্বলের মনে হল—এই বুড়ো-বুড়ীর বেশে স্বয়ং ভগবান যেন তাকে আশ্রয় দিতে এগিয়ে এসেছে।

আশ্রয় নেওয়াই সব চাইতে ভালো। একটা নিরাপদ আশ্রয়—দেহের পক্ষে, মনের পক্ষে আর লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভোম্বলের একান্ত প্রয়োজন।

বুড়ো-বুড়ী এতক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওরা ভাবছিল, সাপের বিষের সেই ঝিষ্‌টা এখনো বোধ করি সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে।

তাই জনতার দিকে তাকিয়ে বুড়ী বললে, 'তোরা বাছা দু'জন জোয়ান ছেলে আমাদের সঙ্গে আয় না। আমাদের কাতুকে পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের বাড়ি বেশী দূরে নয়—এই নদীর কাছেই।

যে দুটি ছেলে জঙ্গলে ঢুকে আজগর সর্দ্দারকে গাছের ডাল এনে দিয়েছিল, তারাই এগিয়ে এলো; বললে আপনাদের কোনো ভয় নেই। জঙ্গল থেকে যখন গাছের

ডাল যোগাড় করতে পেরেছি, তখন আপনাদের ছেলেকেও পৌঁছে দিতে পারবো। কিন্তু একটা কথা—

বুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কি বাবা, বলো, লজ্জা কোরো না।

ছেলে দুটো চোখ পিট্‌পিট্‌ করে জবাব দিলে—আমাদের কিন্তু পেট ভরে খাইয়ে দিতে হবে। সেই সকাল থেকে আপনার কাতুর জন্যে মেহনত আমাদের কম হয় নি।

বুড়ো এইবার ফোকলা দাঁতে ফিক্‌-ফিক্‌ করে হেসে উঠলো; বললে, 'সে-কথা আর তোমাদের বলতে হবে না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার বংশধরকে খুঁজে পেলাম তোমাদের দয়ায়। জানো ত' অতিথি হচ্ছে নারায়ণ। তোমরা আমাদের বাড়িতে হাজির হবে আমার কাতুকে নিয়ে। কাজেই তোমরা হচ্ছ আমাদের কাছে নারায়ণ। যতদিন খুশী থাকো না আমাদের বাড়ি।

একটু থেমে বুড়ো আবার বললে, 'তবে শোনো বাছারা, আমার বাড়ির অবস্থা নেহাৎ খারাপ নয়। ভগবান সবই দিয়েছেন। আমার বাড়ি আছে, পুকুর আছে, গোয়ালভরা গরু আছে। কয়েক শ' বিঘা ধানি জমিও আছে। কিন্তু আমরা চোখ বুজলে কে যে এর ভার নেবে—তাই ভেবে ভেবেই বুড়ো-বুড়ীর চোখের ঘুম চলে গেছে। ভগবানের দয়ায় আজ কাতুকে ফিরে পেলাম—আর আমি কোনো চিন্তা করি নে। তোমরা যাবে আমার সঙ্গে, সে ত' আনন্দেরই কথা। কাতুকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

তখন দুই জোয়ান এগিয়ে এলো। ভোম্বলও ওদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হল। বুড়ো আর বুড়ী আগে চলেছে আর দুই জোয়ান আর ছেলে ভোম্বলকে নিয়ে চলেছে তাদের পিছু পিছু।

বুড়ো-বুড়ীর বাড়ি খুব কাছেই। কাজেই দুই জোয়ানকে বিশেষ কষ্ট করতে হল না।

বুড়ো যা বলেছিল তা' কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা নয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকেই বোঝা গেল—বেশ বাড়-বাড়ন্ত সংসার। মাঝখানে মস্তবড় উঠোন। পাকা দালান অবশ্য নেই। কিন্তু চারদিকে বড় বড় টিনের ঘর। এক কোণে গোয়ালঘর, ঢেঁকিশাল, একটু পেছনে অনেকগুলো ধানের গোলা।

উঠোনের এক কোণে পাকা ইন্দারা। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে গোটা বাড়িটা। যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটে রয়েছে চারদিকে।

টিনের ঘরগুলোর সামনেই একটি করে বাগান। তাতে নামা রকম ফুল ফুটে রয়েছে।

বুড়ী উঁচু দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'কাতুকে তোমরা আগে এই খানেই শুইয়ে দাও। তোমরাও বাছা একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি সকলের

আগে গৃহ-দেবতার একটু পূজো করে আসি। তাঁরই অসীম দয়ায় কাতুকে আজ ফিরে পেয়েছি।

বুড়ী যেন ছুটেই ঘরের ভেতর চলে গেল।

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ বাছারা, তোমরা আগে বিশ্রাম করো। তোমাদের অনেক মেহনত গেছে। তারপর আমি তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি।

বুড়ো জোরে জোরে হাঁক দিলে—ওরে ভোলা, কোথায় গিয়ে রইলি তুই ? আগে তাড়াতাড়ি এই দিকে আয়।

বুড়োর ডাকে একটি পাকাচুলের মানুষ এসে কাছে দাঁড়ালো। দেখে মনে হল—এই বাড়ির পুরোনো চাকর।

বুড়ো বললে, 'হাঁ করে দেখছিস্ কি ? এদ্দিন বাদে আজ ভগবানের দয়ায় আমার কাতুকে ফিয়ে পেয়েছি। আর এই দুটি ছেলে ওকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছে। পুকুরে জাল ফেলতে হবে,—ভালো মাছ তুলতে হবে। গোয়াল থেকে দুধের যোগাড় কর। অতিথি নারায়ণ। ওদের পরমান্ন খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া ওবেলা সত্যনারায়ণের পূজো হবে আমাদের বাড়িতে। পাড়ার সবাইকে বলে আয়।

বুড়ো যে কি করবে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

ভোলা এতক্ষণ মন দিয়ে কর্তার সব কথা শুনলে ; তারপর দু'পা এগিয়ে এসে কর্তার হুকুম তামিল করবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বাড়ির কোন্ দিকে চলে গেল।

প্রতিবেশীদের আর খবর দিতে হল না। ছেলে-বুড়ো-বৌঝির দল যেন কাক-পক্ষীর মুখে সংবাদ পেয়ে দলে দলে এসে গোটা উঠোনটাকে ভর্তি করে ফেললে।

এতদিন তারা অনেকে কাতুর নামই শুনেছে—তাকে চোখে দেখে নি কখনো।

সবাই এগিয়ে এসেছে কাতুকে দেখবার জন্য। পাড়াগাঁয়ে এই জাতীয় মজাদার ঘটনা হামেশা কিন্তু ঘটে না।

একে ছেলেকে খুঁজে পাওয়া গেছে—সেইটেই একটা যথেষ্ট উত্তেজনামূলক ঘটনা। তারপর যখন জানা গেল, এই ছেলেটা সাপের কামড়ে মরেই গিয়েছিল, আজগর সর্দার ঝাড়-ফুক করে ওকে বাঁচিয়েছে, তখন লোক ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল হয়ে উঠলো।

একটি বুড়ী এগিয়ে এল লাঠি ঠুক্-ঠুক্ করতে করতে।

সে ভোম্বলের কাছে এসে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বাড়ীর কর্তাকে ডেকে বললে, 'ও জনাদ্দন, এ তুমি কাদের বাছাকে ঘরে তুলে নিয়ে এলে ? এ ত' আমাদের কাতু নয়!

এমন একটি সুন্দর নাটকের মাঝখানে যদি যবনিকা পড়ে যায় তবে কার ভালো লাগে? বুড়ীর কথা শুনে অধিকাংশ লোক হৈ-হৈ করে উঠলো।

ওরা বললে, 'হ্যাঁ, বিন্দে পিসির যেমন কাণ্ড! বাপ-মা বলছে ও কাতু। আর উনি এলেন ফোপর দালালি করতে!'

আসল কারণটা হচ্ছে, বুড়ো-বুড়ীর অনেক টাকা। আজ যখন কাতুকে পাওয়া গেছে, তখন প্রতিবেশীদের ভালো রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হবেই। মাঝখান থেকে বিন্দে পিসি এসে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে—এই ব্যাপারটা উপস্থিত অনেকেরই পছন্দ হল না।

দু'একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'বিন্দে পিসি,তোমার চোখে ছানি পড়েছে, আগে ছানিটা ভালো করে কাটিয়ে এসো।'

আর একজন টিপ্পনী কাটলে—চশমা না হলে ওকে চিনবে কি করে বিন্দে পিসি?

বিন্দে পিসি তখন আম্‌তা-আম্‌তা করতে থাকে; বলে—আমার কিন্তু মনে হয় ও আমাদের কাতু নয়।

এমন সময় একটি ছেলে নাচতে নাচতে এসে উঠোনে ঢুকল। হাতে তার ঘুড়ি-লাটাই। ছেলেটি দেখতে অনেকটা ভোম্বলের বয়েসী।

সেই ছেলেটিকে দেখে সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো—এই ত পিন্‌টু এসেছে!

—পিন্‌টু কে? পিন্‌টু কে?

—পিন্‌টু হচ্ছে কাতুর খেলার সাথী। ছেলেবেলায় ওরা একসঙ্গে খেলতো যে!

তখন সবাই পিন্‌টুকে এগিয়ে দিলে সামনে।

পিন্‌টু নিশ্চয়ই তার খেলার সাথীকে চিনতে পারবে।

ইতিমধ্যে বুড়ী গৃহদেবতার পূজো সেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো; বললে, 'আয় পিন্‌টু আয়। দেখবি আয় তোর খেলার সাথী কাতু আজ ফিরে এসেছে।'

সবাই উৎসুক হয়ে উঠলো পিন্‌টু কী বলে শুনতে!

ছোট ছেলে হলে কি হবে? পিন্‌টু চট্‌ করে বুঝে নিলে—তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে। সে যদি বলে এই ছেলেটা কাতু নয়, তা'হলে এক মুহূর্তে এই আসর একেবারে ভেঙে যাবে। আর যদি বলে, এই ছেলেই তার খেলার সাথী কাতু, তা'হলে পিন্‌টুর আদর হাজার গুণ বেড়ে যাবে। পিন্‌টুর জন্য আসবে নানা রকমের খেলনা। রোজ এই বাড়িতে খেলার জন্য ডাক আসবে। মিলবে নানা জাতীয় মজাদার খাবার-দাবার।

চালাক ছেলে পিন্‌টু এক মুহূর্তের ভেতর সব কিছু ভেবে নিলে।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছে দাওয়ার দিকে। সবাই তাকে পথ করে দিচ্ছে।

আজ সত্যি পিন্‌টুর সম্মান সব চাইতে বেশী। সে শুধু আজ পাড়ার পিন্‌টু নয় —সোজা কথায় আজ সে বিচারক!

পিন্‌টু আরো এগিয়ে এসে ভোম্বলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তারপর বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই ত আমার খেলার সাথী কাতু।'

জনতা সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠল। বুড়ো তখন সবাইকে শুনিয়ে বললে, 'তোমরা ভাই সবাই আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসো। আজ আমি সত্যনারায়ণের পূজো দেবো। আজ আমার কাতু ফিরে এসেছে। আজ আমার কি আনন্দ!

হঠাৎ উঠোনের এক কোণ থেকে হেঁড়ে গলায় একটা চীৎকার শোনা গেল—না—না!!

সবাই সেই দিকে ফিরে তাকালে। পেয়ারাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি ষণ্ডামার্কা ছেলে। রাগে তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

বুড়ো চীৎকার করে উঠলো—বঙ্কা, তুই আবার আমার বাড়িতে ঢুকেছিস্?

বঙ্কা জবাব দিলে, 'ঢুকবো না? তুমি চোখ বুজলে, এ বাড়ি ত আমার। আমি তোমার ভাইপো, আজ আমাকে বঞ্চিত করে তুমি একটা পথের কুকুরকে কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে? আবার বলছ কিনা সে-ই তোমার কাতু! অমি বলছি তোমাদের কাতু মরে গেছে। বিন্দে পিসিও বলেছে, ও আমাদের কাতু নয়! তবু তুমি জোর করে জাহির করছ, ও তোমাদের কাতু!'

বুড়ী দাওয়া থেকে চীৎকার করে উঠলো—হ্যাঁ, আমি মা। আমি বলছি ও আমাদের কাতু।

বঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—ওই পথের কুকুরকে আমি খুন করবো!

॥ আঠারো ॥

বঙ্কা ছোঁড়া যতই ভয় দেখিয়ে যাক—বুড়ো-বুড়ীর কিন্তু আদরের সীমা নেই!

আর হবেই বা না কেন? হারানো ছেলে ফিরে পেয়েছে, আর যে ছেলে কি না বংশের একমাত্র দুলাল—শিবরাত্রির শলতে! বাড়িতে যদি আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে থাকতো তা'হলে না হয় কথা ছিল।

এই বাড়ি-ঘর দোর, ক্ষেত-খামার, গোয়ালভর্তি দুধোলো :গাই, পুকুরভর্তি মাছ—কে দেখবে, কে খাবে এসব?

বুড়ো-বুড়ী চোখ বুজলেই ত' সাত ভূতে এসে মচ্ছব লাগিয়ে দেবে।

ওই বঙ্কা ছোঁড়াটা তার ভেতরে একজন। উঠতে-বসতে সে কেবলি বুড়ো-বুড়ীকে শাসাচ্ছে। এখন যখন নদীর ধারে কাতুকে পাওয়া গেল তখন বুড়ো-বুড়ী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

সেই সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বললো বঙ্কা ছোঁড়ার। সে পাড়ায় সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো, 'ও কেন কাতু হতে যাবে? ও একটা পথের কুকুর! আমাকে ফাঁকি দেবার জন্যই একটা সাজানো ছেলেকে বাড়িতে এনে হাজির করেছে! ওই বুড়ো-বুড়ী কি কম শয়তান? আমি ওই তিনটাকেই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবো।

বঙ্কা ছোঁড়ার কথা শুনে পাড়ার লোকে ভারী মজা পায়।

দোকানের মুদী, মিষ্টির দোকানের হালুইকর, ঘাটের মাঝি—সবাই ওকে ডাকে; ওকে চটিয়ে দিয়ে মজার মজার কথা শোনে।

পাড়ার মাতব্বরেরা, কিন্তু বঙ্কা ছোঁড়াকে বেশী পাত্তা দেয় না। তার চাইতে বুড়ো-বুড়ীকে তোয়াজ করে চললে লাভ বেশী।

হারানো রতন খুঁজে পাওয়া গেছে বলে বুড়ো-বুড়ী পাড়ার সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে একদিন খাওয়াবে। ভুরিভোজের আশায় সবাই খুশী।

বুড়ো-বুড়ীর ঘরে যেমনি প্রাচুর্য আছে, ঠিক তেমনি দশজনকে খাওয়াতেও তারা ভালোবাসে।

এখন ত' সেই বুড়ো-বুড়ীর আর আনন্দের সীমা নেই। তাদের হারানিধি ফিরে পেয়েছে। বুক ভরেছে বুড়ো-বুড়ীর। দু'হাত তুলে ভগবানের কাছে মানত করছে। পাড়ার দশজনকে এই ত' পেট পুরে খাওয়াবার সময়।

সব চাইতে খুশী হয়েছে পিন্‌টু এ বাড়ীতে তার আদর অনেকখানি বেড়ে গেছে। উঠোন ভর্তি লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই পিন্‌টুই ত' বলেছে—ও ছেলে কাতু ছাড়া আর কেউ নয়। পিন্‌টুই ত' ওর খেলার সাথী ছিল।

পিন্‌টু যদি বলে তা'হলে সবাই সে-কথা বেদবাক্যি বলে মেনে নেবে।

তাই ত পিন্‌টুর আদর এ বাড়িতে এতখানি বেড়ে গেছে।

পিন্‌টুর জন্য নতুন ধুতি-জামা এসেছে, নানা রকম খেলনা এসেছে।

বুড়ো-বুড়ী তাদের কাতুর জন্য যা-যা কিনে আনছে, তার অর্দ্ধেক ভাগ পাচ্ছে ওর খেলার সাথী পিন্‌টু।

পিন্‌টু ত আজকাল আর নিজের বাড়ী থাকে না—দিনরাত এই বাড়ীতেই তার আনাগোনা। এলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছে ক্ষীরের সাজ, চন্দ্রপুলী, ছানার পায়েস এনে ধরে।

সোনা মুখ করে পিন্‌টু সব সাবাড় করে দেয়। মনে মনে ভাবে, ভাগ্যিস কাতু ফিরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি তার ভাগ্যটাও ফিরে গেছে।

এদিকে বুড়ো-বুড়ী কাতুকে কোনো কথাই বলতে দেয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শুধুই—এটা খাও, ওটা খাও। নইলে শরীর সারবে কি করে ?

শরীরে কি আর কিছু আছে ? এমনিতেই পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে দেহটা ত' আধখানা হয়ে গেছে, তার ওপর আবার বিষধর সাপের কামড়। ভাগ্যিস মা মনসার দয়া হয়েছিল, তাই ছেলেটা প্রাণে বেঁচে গেল। কাজেই ভালো করে সেবা-যত্ন না করলে শরীর সারবে কেন ?

আর সেজন্য এক পায়ের ওপর খাড়া রয়েছে পুরোনো চাকর ভোলা। ভোলা কিন্তু কাতুকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। সকাল থেকেই তার সেবা-যত্ন সুরু হয়ে যায়। ভোরের রোদ্দুরে নাকি শরীর তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। তাই ভোলা সকালেই কাতুকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে।

ওদের ঘিরে সেখানে এক আসর বসে যায়। মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। কাতুকে যে কত কথা জিজ্ঞেস করে সবাই ঃ

—কেন বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে ?

—তোমার দুঃখ কিসের শুনি ?

—বুড়ো মা-বাপের মনে কষ্ট দিতে আছে ?

—এত দিন কোথায় কোথায় ঘুরলে শুনি ?

—তোমায় সাপে কামড়ালো কি করে ?

এমনি হাজার জনের হাজার প্রশ্ন। ভোলা কিন্তু কাতুকে কোনো কথারই জবাব দিতে দেয় না, বানিয়ে বানিয়ে নিজেই সব কথার উত্তর দেয়। এ ব্যাপারে বাহাদুরী দিতে হয় ভোলাকে। চমৎকার সব গল্প বানাতে পারে সে।

লোকে ভোলার মুখে মজার মজার কথা শুনে একেবারে তাজ্জব বনে যায়।

বঙ্কা ছোঁড়া আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করে ঘোরে। কিন্তু এত লোকের মাঝে কিছুই করতে পারে না ; শুধু আপন মনে বিড়বিড় করে আর বলে—রোসো, তোমাদের ঘুঘুর বাসা আমি ভাঙছি—

ভোলা ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে সবাইকে বলে—ওই এক বিষধর সাপ ; যাকে কামড়াবে, তার আর রক্ষা নেই।

ভোলার সব কাজ এখন কাতুকে নিয়ে। নদীর ধারে রোদ পোয়ানো হয়ে গেলে, বাড়ী ফিরে কাতুকে গরম দুধ আর সন্দেশ খাওয়ায়।

কাতু মাছের ঝোল-ভাত খাবে বলে ভোলা প্রত্যহ টাট্‌কা কৈমাছ আর মাগুর মাছ ধরে নিয়ে আসে।

বুড়ী মাছের ঝোল ভাত রান্না করে।

ভোলা অনেকক্ষণ ধরে কাতুকে তেল মাখিয়ে দেয়। কবরেজ মশাই কি যেন

করতে হয়।

তারপর স্নান করে দুপুরবেলার খাওয়া। খাওয়ার পরে লম্বা একটা ঘুম।

বিকেলে ঘরে বসেই পিন্‌টুর সঙ্গে নানা রকম খেলা চলে কাতুর। ছানা আর ফল খেতে হয় এক থালা ভর্তি।

কয়েক দিনের ভেতরেই কাতুর শরীরটা দিব্যি ভালো হয়ে গেল।

অনিয়মে আর অত্যাচারে—তার ওপর সাপের কামড়ে ওর শরীরটা সত্যি ভেঙে পড়েছিল। এখন ভোলার সেবা-যত্নে ওর রোগ-বালাই সব দূর হয়ে গেল।

কিন্তু যে কাতু নয়, যে আসলে ভোম্বল—তার চোখে কিন্তু ঘুম নেই।

এখানে কোনো খবরের কাগজ আসে না যে, বাইরের জগতের কোনো খবর পাওয়া যাবে!

সেই সাহেব ব্যাটার যে কী ঘটলো, সেই ঘটনাকে অবলম্বন করে ধর-পাকড় কিছু হলো কিনা, এই বুড়ো-বুড়ীর স্নেহের নীড়ের মধ্যে বসে ভোম্বল সে সব ব্যাপারের কোনো খবরই রাখতে পারে না।

একদিন ভোম্বল ভোলাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, ভোলাদা, এখানে কোনো খবরের কাগজ পাওয়া যায় না?

শুনে ভোলা মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল—না না, এখানে তুমি খবরের কাগজ কোথায় পাবে? হুঁ! বুঝতে পেরেছি। দেহটা একটু ভালো হয়েছে কিনা, তাই মনটা আবার উড়ু-উড়ু সুরু করেছে! সেটি হবে না ভাই,—সে-কথা আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি।

আর একদিন ভোম্বল পিন্‌টুকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললে—আচ্ছা ভাই পিন্‌টু, এখানে খবরের কাগজ আসে না?

কাতুর মুখে সেই কথা শুনে পিন্‌টু শিউরে উঠে বলেছিল—ওরে বাবা! আমি খবরের কাগজ আনতে পারবো না। ভোলাদা আমায় বারণ করে দিয়েছে।

ভোম্বল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে—কেন? খবরের কাগজ পড়লে কি হয়?

পিন্‌টু চোখ দুটো বড় বড় করে জবাব দিয়েছে—হুঁ! আমি বুঝি জানি না ভেবেছ? ভোলাদা আমাকে সব বলেছে।

—কি বলেছে শুনি?

—ভোলাদা বলেছে, খবরের কাগজ পড়লেই তোমার মন উড়ু-উড়ু করবে। আর একদিন তুমি হঠাৎ শিক্‌লি কেটে পালিয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌টুর হাসি দেখে কে!

ও যে সব কিছু জানে—সে-কথা বোঝাতে পেরে পিন্‌টু ভারী খুশী হয়ে উঠল।

ভোম্বল বুঝতে পারলে, পিন্‌টু সব সময় তাকে চোখে-চোখে রাখে।

আর শুধুই কি পিন্‌টু ?

ভোলাদা নিজেই ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে। এতটুকু চোখের আড়াল হতে দেয় না।

ভোম্বল আপন মনে বসে আকাশ পাতাল ভাবে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায় না।

সেদিন অমাবস্যার মিশ্‌কালো আঁধার রাত। সন্ধ্যে থেকে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে।

পিন্‌টু ভোম্বলের সঙ্গে বসে খানিকটা লুডো খেললো। কিন্তু বারে বারেই ভোম্বল হেরে যেতে লাগল।

পিন্‌টু বললে, 'আজ তোর খেলায় মন নেই কাতু! নইলে তুই এমন করে কয়েক বার হেরে যাস্‌ ? থাক খেলা, আয় গল্পের বই পড়ি।'

দু'জনে মিলে শিকার-কাহিনী পড়তে লাগল।

এরই মধ্যে ভোলাদা দুইবার এসে ওদের দেখে গেছে। হাজার কাজের মধ্যেও পাহারা দেওয়ার কথাটা ভোলাদা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না।

আর এক ফাঁকে এসে বুড়ী ওদের দু'জনকে ডেকে নিয়ে গেল। রাত্তিরের খাবার শেষ করে দিলেই নিশ্চিন্ত!

আজকাল পিন্‌টু আর কাতু এক ঘরেই ঘুমোয়। বাইরের দাওয়ায় কম্বল পেতে ভোলাদা দরজা আগলে পড়ে থাকে। পালিয়ে যাবার কোনো পথই খোলা থাকে না।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। বেশ একটু ঠাণ্ডাও পড়েছে।

ভোলাদা শোবার আগে ওদের দু'জনের গায়ে দুটি পাতলা চাদর বিছিয়ে দিয়ে গেল।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে পাশাপাশি দুটি ছেলে। রাত্রি তখন গভীর। দূরে থানার ঘণ্টায় দুটো বাজলো।

এই সময় ওদের জানালার ধারে একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল।

মূর্তিটির সারা দেহ কালো আলোয়ানে ঢাকা। সেই মূর্তিটি এক পা-দু পা করে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো ; তারপর সেই জানালার শিক ধরে উঁচু হয়ে উঠলো।

কালো আলোয়ানটা সরে যেতে দেখা গেল সেই মূর্তিটির হাতে একটি চকচকে ধারালো ছোরা!

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বঙ্কাই চুপি চুপি এসেছে কাতুকে হত্যা করতে,—ওর পথের কাঁটা দূর করতে !

এদিকে কাতু আর পিন্‌টু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তারা দুটিতে এই ঘটনার কিছুই জানতে পারছে না।

যখন বঙ্কা জানালার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সেই ধারালো ছোরাটা কাতুর বুকে বসিয়ে দিতে গেছে —সেই সময় হঠাৎ একটা অঘটন ঘটলো।

কে যেন সেই মিশ্‌কালো আঁধারের ভেতর ঠিক বঙ্কার পেছন থেকে ওর পা দুটো আচম্‌কা টেনে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেল। জানালার শিকের গায়ে ঐ ছোরাটা গিয়ে আছড়ে পড়তে একটা শব্দ হল।

সেই শব্দে ভোম্বলের ঘুম ভেঙে গেল। সে চট্‌ করে উঠে বসলো বিছানায়।

জানালার দিকে তাকিয়ে মৃদু আলোতে ভোম্বল দেখলে,—বঙ্কা ছুটে পালাচ্ছে, আর সেই জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে জীবনদা।

ভোম্বল আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, 'এই যে জীবনদা !'

জীবনদা ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলে উঠলেন—চুপ ! এখন আর কথাটি নয়—

'বন্দরের কাজ হলো শেষ'
যাত্রা করো যাত্রীদল,—এসেছে আদেশ।'

ঘাটে নৌকো বাঁধা ! চুপি চুপি খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আয়। তারপর নৌকোয় বসে সব কথা হবে।

ভোম্বল পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভোম্বল দেখলে—সেখানে তারার দল ঝিকিমিকি করে জ্বলছে।

ভোম্বলের মনে হল, অনেকদিন কারাগারে বন্দী থেকে সে এই মাত্র মুক্তিলাভ করলো !

ছুটে এসে সে জীবনদার ডান হাতখানি চেপে ধরলো।

॥ উনিশ ॥

নৌকোয় উঠে জীবনদা নিজেই হালে গিয়ে বসলেন।

ভোম্বল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি জীবনদা, এবার আপনার সাথী কেউ নেই? একা একা নৌকো ভাসিয়েছেন যে?

জীবনদা মৃদু হেসে উত্তর করলেন—সাথী? তা এই ত' তুই পথের সাথী জুটে গেলি। তারপর মৃদুকণ্ঠে আপন মনেই উচ্চারণ করলেন—

'—হায় রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

বিপ্লবীর কোনো সাথী থাকতে নেই। প্রতি মুহূর্তে সে পথের সাথী বদল করে। নইলে যে তাকে ঘর বাঁধার নেশায় পায়!

ভোম্বল বললো, 'জীবনদা, এবার কিন্তু আপনি একেবারে দার্শনিকের মতো কথা বলছেন। আমি আর থৈ পাচ্ছি না। বাঘের মুখ থেকে ত' বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন! এইবার কি করতে হবে আমায় বলুন।

জীবনদা তেমনি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন; বললেন, 'বাঘের মুখ থেকে তোকে বার করে নিয়ে এলাম, এইবার সিংহের মুখে ঢুকতে হবে বলে।

ভোম্বল অধৈর্য্য হয়ে উত্তর দিলে, 'আপনি কিন্তু আবার ধাঁধার সৃষ্টি করছেন জীবনদা। সহজ সরল ভাষায় বলুন, এবার আমায় কি করতে হবে?

জীবনদা জবাব দিলেন, 'শোন ভোম্বল, এবার তোকে আবার অভিনয় করতে হবে।

তারপর গলা খাটো করে জীবনদা বললেন, 'আচ্ছা ভোম্বল, একে একে তোকে দিয়ে ত' আমি অনেক পার্টই করলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোর ভোম্বল নামটাই টিকে গেল দেখছি। তোর বাপ-মা যে তোর কি নাম রেখেছিলেন সে-কথা বো করি তুই-ও ভুলে গেছিস্!

ভোম্বল খুশী হয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ জীবনদা, এটা খুব খাঁটি কথা বলেছেন। বাপ-মায়ের কথা ভুলেছি, তাঁদের দেওয়া নামটা হারিয়ে ফেলেছি, আজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ কোথায়ও আমার নেই। আপনি শুধু ভালোবেসে আমায় ঘাটে-ঘাটে ফিরি করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! জানি না—ছ্যাতলা-পড়া আর পোকায়-খাওয়া এই সওদা কোন হাটে বিকোবে।

জীবনদা কিন্তু ওর কথা শুনে ভারী মজা পেলেন। তাই আপন মনেই আবৃত্তি করে উঠলেন—

'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান ?
কোথায় রে তোর স্থান ?'

তবে শোন ভোম্বল, এবার তোকে এক ধনীর হাটে বিক্রি করতে নিয়ে চলেছি—

ভোম্বল যেন জীবনদার কথায় সাত হাত জলের তলায় পড়ে গেল ! বললো, 'সব কথা খোলসা করে বলুন জীবনদা,আমি যে কোনো মতেই অগাধ জলে থৈ পাচ্ছি না !

জীবনদা যেন মজা করে সুতোর গিট খুলছেন ! খানিকক্ষণ ভোম্বলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ; তারপর মুখ টিপে রহস্য-উপন্যাসের গোয়েন্দার মতো বললেন' 'হুঁ হুঁ ! এবার তোকে দিয়ে আমরা একটা দরুণ প্রতিশোধ নেবো।'

ভোম্বলের মগজে যেন অনেকগুলো জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ঢুকে পড়েছে। জীবনদার কোনো কথারই কোনো হদিস পাচ্ছে না। সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ; তারপর জিজ্ঞেস করলো—'ধনীর হাটে বিক্রি' আবার 'দারুণ প্রতিশোধ'—এসবের মানে কি বলুন ত' জীবনদা ?

জীবনদা চোখ মট্‌কে বললেন, 'আস্তে আস্তে কথা ভাঙছি। রহস্যের শেষ কথাটা যদি আগেই জানা হয়ে গেল, তা'হলে গল্পের কৌতূহল আর রইলো কোথায় ? জানবি—সব কথা জানবি। তবে ধীরে ধীরে সুতোর গিট খুলতে হবে ত' !

—আচ্ছা, তা'হলে আপনি গিট খুলুন। হতাশার সুরে বললো ভোম্বল।

দুই পা পাটাতনের ওপর মেলে দিয়ে জীবনদা এইবার আরাম করে বসলেন। তারপর একটা হাই তুলে বললেন—কাল সারাটা রাত মশার কামড়ে ভালো ঘুম হয় নি। তোদের ওই ভোলা চাকরটা কিছুতে ঘুমোয়নি। সারা রাত শুধু বারে বারে উঠছে, আর খুটখাট করছে ! তারপর ও যদি কোনো মতে ঘুমোলো ত' এলো আবার বঙ্কা ছোঁড়া ! তার আবার হাতে ধারালো ছোরা

ভোম্বল শিউরে উঠে বললো—একেবারে ডাকাত ছেলে। ওর ধারণা—ওর সম্পত্তি নিয়ে আমি ওখানে গ্যাঁট হয়ে বসে যাবো। তাই একেবারে ছুটে এসেছিল। ভাগ্যিস আপনি সময়মতো এসে পড়েছিলেন। নইলে ওই বঙ্কা ছোঁড়া আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিত !

জীবনদা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উত্তর দিলেন' 'হুঁ ! ভারী ত' সম্পত্তি ওই বুড়ো-বুড়ীর,—তাই নিয়ে এত কাণ্ড ! এইবার তোকে আমি লাখপতি করে দিচ্ছি !

ভোম্বল নড়ে চড়ে বসে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, ব্যাপার কি জীবনদা, বলুন ত' ! সেই তখন থেকে খালি ধানাই-পানাই করছেন ! আসল কথার ধারে কাছেও যাচ্ছেন না !

—তা'হলে এইবার আসল কথা শোন।

জীবনদা আসল গল্পের ঝুলি খুলে বসলেন ঃ

এক রায় বাহাদুর আছে, তার লাখ লাখ টাকা। কিন্তু টাকা ভোগ করবার কেউ নেই তিন কুলে।

এই রায় বাহাদুর সারা জীবন ধরে বহু বিপ্লবীর সর্ব্বনাশ করেছে, আর বহু স্বদেশ-প্রেমিককে ধরিয়ে দিয়েছে বৃটিশের হাতে। লোকটার ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে না?

—কি করে প্রতিশোধ নেবেন?—জিজ্ঞেস করলো ভোম্বল।

জীবনদা জবাব দিলেন, 'এই যখের ধন নিয়ে রায় বাহাদুর মহা বিপদে পড়ে গেছে! না পারছে গিলতে, আর না পারছে ওগড়াতে। তাই বুড়ো মরবার আগে ঠিক করেছে—যাতে সাত-ভূতে তার টাকা লুটে-পুটে খেতে না পারে সেই জন্য পুষ্যিপুত্তুর নেবে! একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোকে এইবার এই পুষ্যিপুত্তুরের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

ভোম্বল বললো, 'কিন্তু আমি যে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ছেলে, সেটা প্রমাণ করবে কে?

জীবনদা বিজ্ঞের হাসি হাসলেন—জানিস্ ত', আমাদের বিপ্লবী দল চারদিকে ছড়িয়ে আছে। যে শিরোমণি ঠাকুরের ওপর রায় বাহাদুরের অগাধ বিশ্বাস, তিনি যে বিপ্লবীদেরও শিরোমণি—সেই কথা ওই বুড়ো রায় বাহাদুর জানবে কি করে?

এই শিরোমণি ঠাকুরই তোকে নিয়ে যাবেন যাত্রার আসরে। তারপর তুই নেচে গেয়ে, 'অ্যাক্টো' করে যাত্রা জমিয়ে তুলতে পারবি নে?

গম্ভীরভাবে ভোম্বল জবাব দিলে, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।

জীবনদা ভোম্বলের মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললেন, 'ওরে দুষ্টু, নিজের দর বাড়াচ্ছিস্ বুঝি? জানিস্, ওই লাখ-লাখ টাকা হাতে এলে বিপ্লবী দলের কাজ কত সহজে এগিয়ে যাবে?

ভোম্বল অবিশ্বাসের হাসি হেসে উত্তর দিলে—কিন্তু ওই ঝুনো রায় বাহাদুর যে আমাকেই পুষ্যিপুত্তুর বলে বেছে নেবে তার কি কিছু ঠিক আছে? সারা জীবন লোক চরিয়েছে —নিশ্চয়ই ধড়িবাজ হবে!

জীবনদা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আরে বোকচন্দর, তা'হলে আমাদের শিরোমণি ঠাকুর রয়েছেন কি করতে? সে-সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুই শুধু তোর 'পার্টটা' ভালো করে অভিনয় করবি যেন কোনো কিছুতে আটকে না যাস্।

ভোম্বল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অঙ্ক কষতে দেবে না ত'? তা'হলে আমি কিন্তু গোল্লা পাবো।

—আরে না না, অঙ্ক কষতে দেবে কেন?

—ইংরজী ট্রান্‌শ্লেশন করতে বলবে না ত' ?

—তা' বলতে পারে।

—তা'হলে কিন্তু আমি রায় বাহাদুরী ইংরেজী বলব ! যেমন—I saw a leg-no-pond. আমি একটি পানা পুকুর দেখলাম।

—হুঁ ! তা'হলে আর পুষ্যিপুত্তুর হতে হবে না !

এই বলে দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলো।

শিরোমণি ঠাকুর ভালো করে বাজিয়ে নিলেন ভোম্বলকে। তারপর বললেন—বেশ চালাক-চতুর ছেলে, ওকে দিয়েই কাজ হবে কিন্তু একটা কাজ তোমায় করতে হবে বাপু।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলো, 'কি কাজ শিরোমণি ঠাকুর ?'

শিরোমণি ঠাকুর অনেকক্ষণ ভোম্বলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ; তারপর বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, এই রায় বাহাদুরের চোখে ধূলো দিতে তুমি পারবে। কিন্তু তোমাকে ব্রাহ্মণের ছেলে সেজে যেতে হবে আমার সঙ্গে। পৈতে একটা ঝুলিয়ে দেবো তোমার গলায়, সেজন্য কোনো ভাবনা নেই। তবে—

—তবে কি ?

—গায়ত্রী মন্ত্র তোমায় মুখস্থ করে নিতে হবে। বুড়ো মহা ধড়িবাজ। কাজেই গায়ত্রী মন্ত্র জিজ্ঞেস করে বসতে পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে, অথচ গায়ত্রী জানো না—এ ত' আর হতে পারে না ! কাজেই ওটা তোমাকে মুখস্থ করে নিতে হবে। আর সব ক্রিয়া-কর্ম আমি তোমায় মুখে মুখে শিখিয়ে দেবো। কেমন ?

সুতরাং ভোম্বলকে গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করে নিতে হল। আর ব্রাহ্মণের ছেলের অন্যান্য নিত্যকর্ম শিরোমণি ঠাকুরের কাছ থেকে জেনে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

শিরোমণি ঠাকুর একদিন ভোম্বলকে পৈতে ঝুলিয়ে, কপালে ফোঁটা কেটে, তারপর একটি শিখা তৈরী করিয়ে—রায় বাহাদুরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

ভোম্বলকে দেখে রায় বাহাদুর বললেন, 'বাঃ বাঃ এ যে একেবারে সর্বসুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান ! একে কোথা থেকে যোগাড় করলেন শিরোমণি ঠাকুর ?

শিরোমণি ঠাকুর উত্তর দিলেন—আজ্ঞে মা-বাপের সঙ্গে ছেলেটি কাশীধামে ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের দু'জনের মৃত্যু হওয়ায় ছেলেটি অনাথ হয়ে পড়ে। তাই আমি ওকে আমার কাছেই নিয়ে এসেছি। ওর মা-বাবা আমারই যজমান ছিল কিনা ! এ আমার একটা গুরু দায়িত্ব।

রায় বাহাদুর শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ; বললেন, 'আমার জন্যই বিশ্বনাথ ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

উত্তেজনায় রায় বাহাদুর ঘন ঘন কাশতে লাগলেন। তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল।

শিরোমণি ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, 'এ সময়ে আপনি এত কথা বলবেন না। একটু বিশ্রাম করুন।

রায় বাহাদুর কিন্তু থামলেন না ; আবার শিরোমণি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা শিরোমণি ঠাকুর, এই ব্রাহ্মণ-পুত্রের নাম কি ?

শিরোমণি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তন দিলেন—ওর নাম বিশ্ববন্ধু। বড় বিনয়ী, বড় ভালো ছেলে। জীবনে সত্যিকারের উন্নতি করবে।

উত্তেজনায় রায় বাহাদুর বিছানার ওপর উঠে বসলেন ; বললেন, 'আচ্ছা শিরোমণি ঠাকুর, আপনি ত' জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী। শ্রীমানের হস্তরেখার বিচার করেছেন কি ?'

শিরোমণি উত্তর দিলেন—না রায় বাহাদুর, সেটা ত' দেখা হয় নি।

রায় বাহাদুর ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন—আপনি আগে দেখুন শিরোমণি ঠাকুর, ওর হস্তরেখায় আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ?

শিরোমণি ঠাকুর নিজের চশমাটা বের করে চোখে লাগিয়ে নিলেন। তারপর ভোম্বলের হাতখানি টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

রায় বাহাদুর উত্তেজনায় যেন কাঁপছিলেন। তাঁর হাঁপানির টানও বেশ বেড়ে উঠেছিল।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে রায় বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন—শিরোমণি ঠাকুর, 'আপনি কি দেখছেন শীগ্‌গির আমায় বলুন। আমাকে আর এমন উৎকণ্ঠায় রাখবেন না।'

শিরোমণি ঠাকুর বেশ অভিনয় করতে পারেন দেখা গেল। চশমাটা চোখের ওপর ভালো করে বসিয়ে ভোম্বলের হাতটা উল্টেপাল্টে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন! তারপর মুখ তুলে বললেন, 'হুঁ। এতদিন ত' ওর হাত দেখি নি। 'এদিকে অনাথ বালকের রেখা রয়েছে ; ওদিকে আবার রাজযোগ। অদ্ভুত হাত—রায় বাহাদুর !'

রায় বাহাদুর চীৎকার করে উঠে বললেন, 'আর আমার মনে দ্বিধা নেই শিরোমণি ঠাকুর ! বিশ্বনাথ বিশ্ববন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি সব ব্যবস্থা করুন। আমি এই সুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকেই পোস্যপুত্র রূপে গ্রহণ করবো।···ওরে কে কোথায় আছিস্, আমার নায়েবকে ডাক। শাস্ত্রানুসারে আমি এই দত্তকপুত্র গ্রহণ উৎসব

সম্পন্ন করবো। প্রচুর লোকজন খাওয়াবো। কাঞ্চন আর সবৎসা ধেনু ব্রাহ্মণদের দান করবো।...শিরোমণি ঠাকুর, আপনি পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করুন।

অতি আনন্দে আর উত্তেজনায় রায় বাহাদুর বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়লেন।

শিরোমণি ঠাকুর ভাবছিলেন, এখুনি যদি বুড়ো টেঁসে যায়, তা'হলে ত' সব মাটি!

॥ বিশ ॥

কোনো রকমে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন রায় বাহাদুর। অনেক আত্মীয়-স্বজন এসে ভীড় করেছে বাড়িতে। তারা যেন রায় বাহাদুরের অসুখের খবর পেয়েই নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে এসে পড়েছে এই রকম একটা ভাব দেখাচ্ছে সবাই।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সকলেই মনে প্রাণে কামনা করছে—পুস্যিপুত্র নেবার আগেই রায় বাহাদুরের মৃত্যু হোক। তা'হলেই তারা দশজনে মিলে কালনেমীর লঙ্কাভাগ করে নিতে পারে—রায় বাহাদুরের এই বিরাট সম্পত্তিকে।

কিন্তু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখে ছাই দিয়ে রায় বাহাদুর আবার দিব্যি খাড়া হয়ে উঠলেন।

খাস খানসামা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ভালো অম্বুরী তামাক সেজে রায় বাহাদুরের হাতে নলটা তুলে ধরলে। খুশী হয়ে বাড়ির কর্তা গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানতে লাগলেন।

প্রথমেই ডাক পড়লো শিরোমণি ঠাকুরের। রায় বাহাদুর বললেন, 'আমি আর একদিনও বিলম্ব করতে চাই নে। আমার টাকার অভাব নেই। আপনি আজই পোস্যপুত্র গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করুন। আমার ম্যানেজার আছে—চাইলেই টাকা পাবেন। লোকজন রয়েছে প্রচুর, তারা খাটবে। কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।

তারপর একটু গলা খাটো করে বললেন, 'বুঝতেই ত' পারছেন শিরোমণি ঠাকুর, আপনার কাছে আমার লুকোবার কিছুই নেই। চারদিকে শকুনি-গৃধিনী আর শেয়ালের দল ওৎ পেতে আছে। আমি চোখ বুঁজলেই আমার বিরাট সম্পত্তি একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে ছাড়বে।

কথায় বলে, পাগলা খাবি? না, আঁচাবো কোথায়?

শিরোমণি ঠাকুর ত' তাই চান।

তিনি একজন সেরা বিপ্লবী। যে করেই হোক, নিজের বুদ্ধিবলে রায় বাহাদুরের

বিশ্বাসভাজন হয়েছেন। এই সুযোগে কোনো রকমে একটা লোক-দেখানো পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাতে যদি পারেন তা'হলে এই বিরাট সম্পত্তি বিপ্লবীদের হাতে আসে। এই পোষ্যপুত্রের অভিভাবক হবেন শিরোমণি ঠাকুর নিজে। তখন বিপ্লবীদের কাছে অর্থের আর কোনো অভাব হবে না।

মনে মনে ভারী খুশী হলেন শিরোমণি ঠাকুর। কিন্তু তিনি শুধু বিপ্লবী নন, একেবারে পাকা অভিনেতা। তাই যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবলমাত্র রায় বাহাদুরের অনুরোধেই এই ঢোক গিলছেন এমন একটা মুখের ভাব করলেন তিনি। বললেন, 'আপনার অনুরোধ আমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি নে রায় বাহাদুর। আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করে পুষ্যিপুত্র নেবার সব ব্যবস্থা আমি এক্ষুণি করে ফেলছি।

রায় বাহাদুরের ম্যানেজার যে শিরোমণি ঠাকুরের হাতে গড়া শিষ্য এবং আদর্শ বিপ্লবী সে-কথা রায়বাহাদুর জানবেন কি করে? এমন কি কর্তার খাস খানসামাটি অবধি একজন বিপ্লবী।

আটঘাট না বেঁধে শিরোমণি ঠাকুর কোনো কাজে হাত দেন না।

গোপনে বিপ্লবীদের একটা পরামর্শ হয়ে গেল। সে-কথা রায় বাহাদুর ত' দূরের কথা, বাড়িব আত্মীয়-স্বজন কাকপক্ষীতেও জানতে পারলো না!

আত্মীয়-স্বজনরা যাতে 'শুভ-কাজে' কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে বিপ্লবীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আত্মীয় আছেন, আত্মীয় থাকুন। ভালো-মন্দ খান-দান, আর নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করে নাক ডাকুন। কোনো কাজে বাধা দিতে এলেই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—হুঁসিয়ার সবাই।

'মিলিটারী ডিসিপ্লিনে' কাজ চললো শিরোমণি ঠাকুরের। তা ছাড়া বিপ্লবীদের আরো একটা ভয়ের কারণ আছে। রায় বাহাদুরের শরীরের যে অবস্থা তাতে তিনি যে কোন মুহূর্তে উত্তেজনায় 'হার্ট ফেল' করতে পারেন। সুতরাং 'আজ' হলে সে কাজ 'কাল' করা চলবে না—কোনো মতেই।

ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ এগিয়ে চললো। ম্যানেজারবাবু ঢালা আদেশ জারি করেছেন—দত্তকপুত্র গ্রহণের জন্য ষ্টেট থেকে সব রকম ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

আত্মীয়-স্বজনদের মোড়ল হচ্ছেন গদাইবাবু। তিনি দেখলেন, পোষ্যপুত্র নেওয়া আর কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না!

তখন গদাইবাবু এক কৌশল অবলম্বন করলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শিরোমণি ঠাকুরকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

তারপর হঠাৎ শিরোমণি ঠাকুরের দুটো পা জড়িয়ে ধরে গদাই বললেন, 'আপনি আমাদের বাঁচান শিরোমণি ঠাকুর!'

কিছুই যেন বুঝতে পারেন নি, এমনি মুখের ভাব করে শিরোমণি ঠাকুর দু' পা পিছিয়ে গিয়ে উত্তর দিলেন—এ কি গদাইবাবু, আপনি গণিমান্যি ব্যক্তি—আমার পা জড়িয়ে ধরছেন কেন ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি নে !

গদাইবাবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না শিরোমণি ঠাকুর ? ওই ভাগাড়ের শকুনটার মরণকালে ভীমরতি হয়েছে, তাই এই সময় একটা অজানা-অচেনা ছেলেকে কুড়িয়ে এনে পুষ্যিপুত্তুর করে নিচ্ছে। আপনি আমাদের বাঁচান শিরোমণি ঠাকুর। এই ছেলে-খেলা আপনি পণ্ড করে দিন।'

শিরোমণি ঠাকুর আরো অবাক হবার ভান করে উত্তর দিলেন—দেখুন, আমি কি করতে পারি গদাইবাবু বলুন ? ওঁর সম্পত্তি, উনি যদি বিলিয়ে দেন, তা'হলে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে ? আর উনি আমাদের কথা শুনবেনই বা কেন ?

উত্তেজিত হয়ে গদাইবাবু বললেন, 'শুনবেন শিরোমণি ঠাকুর, নিশ্চয়ই শুনবেন। আমরা সবাই জানি, রায় বাহাদুর আপনার কথা বেদ-বাক্যি বলে মনে করে। আপনি শুধু বলুন, দত্তকপুত্র গ্রহণের শুভদিন এখন পাঁজিতে নেই। এই মাসটা তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই কাজের জন্য আমরা আত্মীয়-স্বজনের দল সমবেত-ভাবে আপনাকে একলাখ টাকা দেবো।

শিরোমণি ঠাকুর যেন খুব লোভে পড়ে গেছেন—এমনি মুখের ভাব করে বললেন, 'একলাখ টাকা আপনারা আমায় দেবেন ? আপনি কি বলছেন গদাইবাবু ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না…আমার মাথা ঘুরছে !

গদাইবাবু উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলেন—আপনার মাথা ঘোরার আমরা চিকিৎসা করবো। আপনি আমাদের সঙ্গে হাত মেলান। পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া পণ্ড করে দিন। তারপর চাকর বেটাকে হাত করে রায় বাহাদুরের ওষুধের সঙ্গে আমরা বিষ মিশিয়ে দেবো। দেখি, ওই বুড়ো হাড় আর কয় দিন টেঁকে ! তখন আপনাকে আরো একলাখ টাকা নগদ দেবো আমরা। শুধু সম্পত্তিটা একবার হাতে আসতে দিন। আপনার কোনো অভাব আমরা রাখবো না।

শিরোমণি ঠাকুর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু মানুষ খুনের ব্যাপার ! আমার বুক কাঁপছে। আমায় একটু ভেবে দেখতে দিন।'

—হ্যাঁ, ভাবুন, ভাবুন, শিরোমণি ঠাকুর, আপনাকে আর কষ্ট করে বাড়ি বাড়ি চাল-কলা বাঁধতে হবে না। শেষ বয়েসে আপনি পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করে রাজভোগ খাবেন। সে ব্যবস্থা আমরা সবাই মিলে করে দেবো। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে মিতালি পাতান।

শিরোমণি ঠাকুর ভেবে দেখলেন, এইসব কাল-সাপদের আগে থেকে চটিয়ে

কোনো লাভ নেই। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সাপও না মরে আর লাঠিও না ভাঙে।

তাই তিনি যেন ভারী ভড়কে গেছেন এই ভাব দেখিয়ে গদাইবাবুর কাছ থেকে সময় চেয়ে নিলেন। আর গোপনে ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিলেন—আজই পোষ্যপুত্র নেবার পর্বটা শেষ করে নিতে হবে। ওদের মতিগতি বিশেষ ভালো নয়। কি জানি, সম্পত্তির লোভে ওরা যদি রায় বাহাদুরকে বিষ দিয়ে বসে তা'হলে বিপ্লবীদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রায় বাহাদুর যেমন ধূমধাম করে অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন—তা হলো না বটে, তবে শিরোমণি ঠাকুরের পাকা মগজের বুদ্ধিতে সেই দিনই দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়ে গেল।

রাত্তিরে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসে এই বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেন। রায় বাহাদুর যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলেন চারদিকে তার সাক্ষী রাখতে হবে ত'! এ বিষয়ে শিরোমণি ঠাকুরের আর ম্যানেজার বাবুর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ!

কাজের বাড়ি। অনেক সময় সিঁড়ি দিয়ে নামবার-ওঠবার সময় শিরোমণি ঠাকুর আর গদাইবাবু সামনা-সামনি পড়ে গেছেন। সেই সময় গদাইবাবুর চোখে যে প্রতিহিংসার আগুন দেখা গেছে—তাতে শিরোমণি ঠাকুরের মতো অভিজ্ঞ লোকও চমকে উঠেছেন।

কাল-সাপের দল না জানি কোথায়—কেমন করে বিষ ঢালে!

সত্যি, মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন শিরোমণি ঠাকুর।

তাই কর্তার খাস খানসামাকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'খুব হুঁসিয়ার. কাল-সাপের দল না জানি কি বিপদ বাঁধায়।' রায় বাহাদুরের কাছে সব সময় যদিও আমাদের কাজ হাসিল হয়েছে, তবু রায় বাহাদুরের আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার। সব কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকাপাকি করে নিতে হবে। তখন আত্মীয়-স্বজনদের হটিয়ে দিতে আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

খাস খানসামা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, 'সে সারারাত ঘুমুবে না, রায় বাহাদুরের ঘরে পাহারা দেবে। রাত্রির বেলা কাক-পক্ষীকেও ঢুকতে দেবে না রায় বাহাদুরের ঘরে।

শিরোমণি ঠাকুর এই বেলা নিশ্চিন্ত হলেন। সারা দিনে অনেক পরিশ্রম গেছে। একদিকে রায় বাহাদুরকে দিয়ে কাজটা সমাধা করে নিতে হবে, অন্যদিকে কাল-সাপ আত্মীয় স্বজনকে সামনে রাখতে হবে!

বিপদ যে কখন কোন্ দিক দিয়ে আসে—কেউ বলতে পারে না।

এইবার তিনি নিশ্চিন্ত। সেই রাত্রে কত দিন পর তিনি ঘুমুতে পারবেন।

কয়েক মাস হয়ে গেল—তাঁর চোখে ঘুম নেই।

পরিকল্পনাটাকে কার্যে পরিণত করতে হলে পা টিপে টিপে এগুতে হয়। পথটা সত্যি পিছল। ঠিক বিপ্লবীর কাজ এটা নয়। কিন্তু ছলে বলে কৌশলে কার্যোদ্ধার করতেই হবে।

তখন নিশ্চিন্তমনে তিনি বিপ্লবীদের সংগঠন করতে পারেন।

রায় বাহাদুরের এই পাপপুরী ছেড়ে জন্মের মতো চলে যাবেন তিনি। এই গৃহে কত বিপ্লবী কত নির্য্যাতন সহ্য করেছে। শিরোমণি ঠাকুরের কোনো কিছুই অজানা নয়।

আজ এত দিন পরে—রায় বাহাদুরের ওপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন তিনি।

মনে মনে হাসলেন শিরোমণি ঠাকুর।

ম্যানেজার এসে বললেন, 'সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে আপনার। এইবার কিছু মুখে দিন।

বৃদ্ধ বিপ্লবীর মুখে তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'আজ আর কিছু খাবো না। এক গ্লাস মিশ্রীর সরবৎ যদি পাই—

শিরোমণি ঠাকুরের কথাটা শেষ হতে পারলো না। রায় বাহাদরের খাস খানসামা ছুটে এসে বলে, 'আমাদের নতুন মনিবকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

শিরোমণি ঠাকুর আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলেন—অ্যাঁ! বিশ্ববন্ধু নেই? কোথায় গেল সে?

খাস খানসামা উত্তর দিলে, 'পাতি-পাতি করে আমি গোটা বাড়ি খুঁজেছি। কোথায়ও নতুন মনিব নেই।

শিরোমণি ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই ওই কাল-সাপের কাজ। হুঁ! আমি বুঝতে পেরেছি। তীরে এসে কি তরী ডুববে?

শিরোমণি ঠাকুর পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। যেন বাঘকে কে খাঁচার মধ্যে পুরেছে। তার বেরিয়ে আসবার কোনো উপায় নেই—নিস্ফল আক্রোশে সে কেবিল গর্জ্জন করছে!

হঠাৎ শিরোমণি ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এক কাজ করো তোমরা। বাড়ির সদর দরজায় কুলুপ এঁটে দাও। ওই কাল-সাপের দলকে আমি দেখছি। যদি ওরা বিশ্ববন্ধুকে বের করে না দেয়, তা'হলে ওরাও কেউ প্রাণ নিয়ে বাড়ির বাইরে পা দিতে পারবে না।

এই প্রবীণ বিপ্লবীর যেন হঠাৎ নব-যৌবন ফিরে এলো।

শিরোমণি ঠাকুর নিজের গা থেকে নামাবলী দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর এক গুপ্ত জায়গা থেকে একটা বন্দুক বের করে নিয়ে এলেন। কাউকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি গদাইবাবুর ঘরের দরজায় গিয়ে ঘন ঘন করাঘাত করতে লাগলেন।

হঠাৎ গদাইবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দরজা খুলেই শিরোমণি ঠাকুরের ওই সংহারমূর্তি দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুলো না। গলার ভেতরটা কে যেন শক্ত হাতে চেপে ধরেছে। তাঁর মনে হতে লাগলো যেন চিরকালের মতো কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল!

কিন্তু শিরোমণি ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বন্দুক বাগিয়ে ধরে হুমকি দিয়ে বললেন, 'শুনুন গদাইবাবু, ভালোয় ভালোয় বিশ্ববন্ধুকে বের করে দিন। নইলে দেখছেন ত' আমার হাতে বন্দুক। এই রাতের অন্ধকারে আপনাকে খুন করে রায় বাহাদুরের উঠোনে পুঁতে ফেলে সিমেন্ট লাগিয়ে দেবো। কাক পক্ষীতেও সেকথা জানতে পারবে না। তারপর রটিয়ে দেবো যে, রায় বাহাদুরের সঙ্গে ঝগড়া করে আ[illegible] বাড়ি ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন।

গদাইবাবু তখন বলির পাঁঠার মতো কাঁপছেন। শিরোমণি ঠাকুর—যিনি পূজো-আর্চ্চা নিয়ে থাকেন—তিনি কিনা বন্দুক ধরে তাঁকে খুন করতে ছুটে এসেছেন—এই মাঝরাতে!

নাঃ, পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! শিরোমণি ঠাকুর কিন্তু ছাড়বেন না ওঁকে।

শিরোমণি ঠাকুর হুমকি দিয়ে আবার বললেন—কী? মুখে যে আর কথা নেই!

কেউ বোবাকাঠি ছুঁয়ে দিল নাকি ? বিশ্ববন্ধুকে বের করে না দিলে আপনার প্রাণ থাকবে না, এই শেষ কথা বলে দিয়ে গেলাম।

গট্-গট্ করে চলে এলেন শিরোমণি ঠাকুর। তিনি তখন আর চাল-কলা-বাঁধা পূজুরী বামুন ঠাকুর মন—একেবারে যেন 'মিলিটারী ম্যান' হয়ে ফিরে এসেছেন।

ওদিকে রায় বাহাদুরের খাস খানসামা গিয়ে রায় বাহাদুরের কানে কথাটা তুলে দিয়েছে—আমাদের নতুন মনিবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কর্তা !

খবর শুনেই রায় বাহাদুর চীৎকার করে উঠলেন—কী ! এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমি এখনো মরি নি ! এখনই কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করেছে !···এই কে আছিস্. আগে সদর দরজা বন্ধ করে দে। তারপর আমার চাবুকটা নিয়ে আয় ! আমি নিজের হাতে সবাইকে চাবুক চালাবো। রায় বাহাদুর এখনো মরে নি !

প্রবল উত্তেজনায় রায় বাহাদুর হাঁপাতে লাগলেন।

খাস খানসামা ওঁকে বিছানায় শুয়ে দিলে। কিন্তু রায় বাহাদুর অত সহজেই দমে গেলেন না। তিনি একটু দম নিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলেন। সারা জীবন বহু লোককে শায়েস্তা করেছেন। আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে ব্যাঙের লাথি খেতে তিনি রাজী নন !

তা ছাড়া তাঁর নিজের সম্পত্তি—তিনি সাতভূতের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন কেন ?

পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছেন—বেশ করেছেন। তাঁর নিজের টাকা যে ভাবে খুশী উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবেন তিনি। তাতে কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না ! তাঁর মনের বাসনা—এই পুষ্যিপুত্তুরকে তিনিমনের মতো ট্রেনিং করে দিয়ে যাবেন। তারই কাজের ভেতর দিয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চান। নিজে যা করতেপারেন নি—এই পুষ্যিপুত্তুরের হাত দিয়ে তিনি তাই করাবেন। নিজের পল্লীতে নিজের নামে একটা বিদ্যালয় খুলে দেবেন। মায়ের নামে একটি আরোগ্য-নিকেতন স্থাপন করবেন। একটি পাঠাগার গড়ে তুলবেন নিজের বাপের স্মৃতিরক্ষার জন্য। এইসব পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছে শেষজীবনে। রায় বাহাদুরের মনে এ বাসনাও আছে যে, নিজের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে তাঁর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করবেন। নিজে ত' সে-সব করতে পারেন না। তাই ছেলের হাত দিয়ে নিজের এইসব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন।

কিন্তু যত গোলমালের সৃষ্টি করেছে এই সব লোভী কুকুরের দল। তিনি ওদের হাতে একটি কানাকড়িও তুলে দেবেন না। উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন সবাইকে।

খাস খানসামা কর্তাকে জানিয়ে দিলে যে, শিরোমণি ঠাকুরের আদেশে বাড়ির সদর দরজা আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শুনে ভারী খুশী হলেন রায় বাহাদুর ; মৃদু হেসে বললেন, 'শিরোমণি ঠাকুরের সব দিকে দৃষ্টি আছে। সেই জন্যই আমি ওঁকে এত ভালবাসি।'

রায় বাহাদুরের হুঙ্কার শুনে সারা বাড়িটা যেন থমথম করতে লাগলো।

ভীরু প্রকৃতির আত্মীয়-স্বজনেরা ভাবতে লাগলো—এ ত' আচ্ছা গেরোতে বাঁধা পড়া গেল। সম্পত্তির লোভ করতে এসে এখন বেঘোরে প্রাণ না যায়!

একটি নৌকো ভেসে চলেছে সেই আঁধার কালো রাতের বুক চিরে।

চারজন লোক ক্রমাগত দাঁড় টেনে চলেছে। মুখে তাদের কোনো কথা নেই।

আর দু'টি মানুষ চুপচাপ নৌকোর মাঝখানে বসে। তাদের মুখও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

এই ভাবে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল।

একে আঁধার রাত, তার ওপর মেঘের খেলা চলছে আকাশের গায়। মেঘের আনাগোনায় তারাদল মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে।

বয়েসে যিনি বড় তিনি নৌকোর মাঝখানে বসে সেই তারাদলের লুকোচুরি খেলা দেখছিলেন।

পাশে বসা ছেলেটিই প্রথমে কথা বললে, 'আচ্ছা জীবনদা, হঠাৎ আমায় নিয়ে পালিয়ে এলেন কেন? ব্যাপারটা ত' কিছুই বুঝতে পারলাম না। দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম নিজের ঘরে শুয়ে। আপনি এসে চুপি চুপি আমার ঘুম ভাঙিয়ে এক রকম পালিয়েই চলে এলেন। আসবার সময় শিরোমণি ঠাকুরকে পর্য্যন্ত কিছু বলা হল না।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'দেখ ভোম্বল, সব কথা তোর শুনে কাজ নেই। শুধু এই কথা জেনে রাখ, ও রকম ভাবে পালিয়ে না এলে তোকে বাঁচানো যেত না।'

—আমাকে বাঁচানো যেত না? কেন ব্যাপারটা কি? সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। কোনো দিন আপনার কাছে কোনো কথা জানতে চাই নি। আজ কিন্তু আমায় সব কথা খুলে না বললেই চলবে না।

ভোম্বলের চোখে মুখে একটা কৌতূহল জেগে উঠলো।

সেই মুখের দিকে জীবনদা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

—তা'হলে নেহাৎই শুনতে চাস্?

—জীবনদা, আমাকে আর আঁধারে রাখবেন না। সব কথা আমায় খুলে বলুন। আমি জানি না, আমাদের সম্পর্কে শিরোমণি ঠাকুর কি ভাবছেন।

জীবনদা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—তা একটু ভাবছেন বৈ কি!

ভোম্বল আঁতকে উঠে উত্তর দিলে—কি সর্বনাশ!

জীবনদা বললেন, 'তা'হলে শুনেই রাখ। আমি হঠাৎ খবর পেলাম গদাইবাবু একটা গুণ্ডা বাড়ির ভেতর নিয়ে এসেছেন। সে টাকার লোভে তক্ষুণি তোকে খুন করে লাস নিয়ে পালিয়ে যাবে। কাউকে খবর দেবার সময় ছিল না। তাই

তাড়াতাড়ি তোকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই ছিল না তখন।

ভোম্বল অবার বললে, 'কী সর্বনাশ! আমার একটার পর একটা ফাঁড়া মন্দ কাটছে না বলুন!'

প্রথমে সাপের কামড়। কোনো রকমে ওঝার মন্তরে প্রাণটা ফিরে এলো।

তারপর আবার নৈশ আক্রমণ। সে সময়ও জানালার ধারে গিয়ে আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন!

জীবনদা হেসে উত্তর দিলেন—আরে, আমর নামই যে জীবন।

ভোম্বল বললে, 'আবার নতুন করে এই কেলেঙ্কারী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। ভেবে দেখতে গেলে আমার জীবনটাই যেন একটা বিরাট উপন্যাস।'

জীবনদা মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন,'হ্যাঁ, প্রত্যেকের জীবনই এক একটা উপন্যাস। শুধু গুছিয়ে লিখতে জানা চাই! ভগবান ছক করে ত' জীবন তৈরী করেন না! এক এক জনের জীবননদী এক এক দিকে বয়ে যায়।'

ভোম্বল শুধোলে, 'আচ্ছা জীবনদা, আমাদের পালিয়ে আসার আসল ব্যাপারটা ত' শিরোমণি ঠাকুর জানতে পারছেন না। ওরা ত' খুব চিন্তায় পড়বেন।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'তা একটু চিন্তায় পড়বেন বৈ কি। শিরোমণি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস না করে আমরা ত' কোনো কাজ করি না! কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ ক্ষেত্রে গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। দুর্ঘটনা একটা ঘটে গেলে আফশোষের অন্ত থাকতো না। এখন তোঝে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে—তাড়াতাড়ি আমায় আবার রায় বাহাদুরের বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'জীবনদা, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ভোম্বলের প্রশ্ন শুনে এবার জীবনদা মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন; তারপর একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বল ত' তোকে এবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?'

ভোম্বল বললে, 'কি জানি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন! আপনার মনের ভেতর ঢোকা কি সহজ কথা! হয়ত নিয়ে যাচ্ছেন কোনো রেল লাইনের ধারে, কিংবা কোনো অজপাড়াগাঁয়ে লুকিয়ে থাকবার জন্য! অথবা কারো বাড়িতে চাকর সেজে কাজে লাগতে!'

বলতে বলতে আপন মনেই হো-হো করে হেসে উঠলো ভোম্বল। তারপর বললে, 'মজা মন্দ নয়।'

জীবনদার চোখে-মুখেও কৌতুক যেন নেচে বেড়াচ্ছে; জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, মজাটা কি সত্যি করে বল ত' ভোম্বল?

ভোম্বল জীবনদার কাছে আরও একটু ঘেঁষে বসে উত্তর দিলে—মজা নয়? এই

কিছুক্ষণ আগে ছিলাম—এক খেয়ালী বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর! আর খানিক বাদেই হয়ত এক রাগী মানুষের চাকর হয়ে বাসন মাজতে সুরু করতে হবে। আমার জীবনের নাটকটা প্রতি দৃশ্যেই বেশ জমে যাচ্ছে। নতুন নতুন পরিবেশ—নতুন নতুন ভূমিকা নতুন নতুন বেশ পরিবর্তন।

শুনে জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠলেন। চারজন মাঝি কিন্তু নিঃশব্দে নৌকো বেয়েই চলেছে।

অন্ধকার রাতে আকাশে মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে। কখনো তারার দলকে দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো বা ওরা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে।

ভোম্বল বললে, 'আজ বড়লোকের বাড়িতে দারুণ ভোজ হয়েছে। আর বসে থাকতে পারছি না জীবনদা! আমার দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে।'

জীবনদা বললে, 'রাত শেষ হতে এখনো বেশ দেরী আছে। তুই পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নে না—আমি ঠিক জেগে আছি।'

ভোম্বল সবে তার দেহটা এলিয়ে দিয়েছে এমন সময়—একটু দূরে নদীর বুকে বাঁশীর শব্দ শোনা গেল।

জীবনদা চমকে উঠলেন; বললেন, 'আর তোর ঘুমোনো হলোনা ভোম্বল। জলপুলিশ আমাদের গন্ধ পেয়েছে। তুই তাড়াতাড়ি একটা চাষার ছেলের পোষাক পরে নে। পাটাতনের তলাতেই পোষাকের সরঞ্জাম লুকানো আছে। তারপর কল্‌কে নিয়ে তামাক সাজতে বসে যা।

॥ বাইশ ॥

সত্যি.—শেষ পর্যন্ত জলপুলিশ এসে ওদের নৌকোটা ধরে ফেললে। লঞ্চ থেকে নেমে এলো এক জমাদার।

গোঁফ চুমড়ে পুলিশের লোক বললে—খবরদার, পালাবার চেষ্টা করলে, আর নদীতে লাফিয়ে পড়লে গুলী করে কুকুরের মতো মেরে ফেলবো।

জীবনদা ইতিমধ্যে একেবারে বোকা চাষা সেজে গেছেন! বললেন, 'আজ্ঞে কর্তা, পালাবো কেন? চুরিও করি নি, ডাকাতিও করি নি। হাটে গিয়েছিলাম ছেলেটাকে নিয়ে, এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছি।'

পুলিশের লোকটা কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি দিতে চায় না। জিজ্ঞেস করলে—হুঁ! হাটে গিয়েছিলি? তা তোদের নৌকোতে সওদা কোথায়? কি কিনেছিস্ হাট থেকে শুনি?

জীবনদা হঠাৎ বোকা চাষার মতো হি-হি করে হেসে উঠলেন।

পুলিশের জমাদারটা লাঠি দিয়ে একটা খোঁচা মেরে বললে—আরে, পাগল নাকি? হাসছে দেখ!

জীবনদা বললেন, 'আজ্ঞে কর্তা, সওদা করতে ত' হাটে যাই নি।'

—তবে কি করতে গিয়েছিলি? তামাশা দেখতে?

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর পুলিশের লোকের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে কর্তা, আমার দুটো বোকা পাঁঠা ছেল, তাই ত' হাটে বিক্কির করে দিয়ে অ্যালম।

এইবার পুলিশের জমাদরটা চটে গেল—বোকা পাঁঠা! চালাকি পেয়েছ? লাঠির খোঁচা দিয়ে একেবারে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবো।'

জীবনদা বোকা চাষার মতো তেমনি হো-হো করে হাসতেই লাগলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন—পেটের মধ্যি আমার কিচ্ছু নেই কর্তা। শুধুই পান্তাভাত আর প্যাঁজ! হি—হি—হি!

পুলিশের জমাদার আর কথা কাটাকাটি না করে তার সহকারী সহ জীবনদার নৌকোটা তন্নতন্ন করে তালাস করলে। কিন্তু এক পুঁটুলি চিড়ে-গুড়, আর হুঁকো-তামাক-টিকে ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না।

মোটা জমাদারটা আর একবার লাঠির খোঁচা দিয়ে বললে—যা—এবার তোরা খুব বেঁচে গেলি! ধরা-ছোঁয়ার কিচ্ছু রাখিস্ নি দেখছি। এই স্বদেশী বাবুগুলো হাড়বজ্জাত! একেবারে চেনবার যো নেই। মনে হয় যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু হাতে-নাতে যদি একবার পাই শ্রীঘরে ঘানি টানিয়ে তবে ছাড়বো।

জলপুলিশের লঞ্চটা ঠকে গিয়েই যেন দূরে চলে গেল।

ভোম্বল পাটাতনের ওপর টান-টান শুয়ে পড়ে বললে—যাক, তা'হলে আর একটা ফাঁড়াও কাটলো!

জীবনদা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল হবে ত!

জীবনদার ডিঙি নৌকো আবার ভেসে চললো নদীর পথ ধরে।

ভোম্বল শুধোলে আচ্ছা জীবনদা, পথের বিপদ ত' কাটলো, এইবার সত্যি করে বলুন ত' আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনদা মুচকি হেসে উত্তর দিলেন—'অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন শুনি ? জানিস্ ত'—সবুরে মেওয়া ফলে !

ভোম্বল বললে, 'তা ত' জানি। কিন্তু আমার মগজে সে মেওয়া যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে !'

জীবনদা ফোঁড়ন কাটেন—সেই শুকনো কাঠেই আবার ফুল ফুটবে—দেখে নিস্ তুই ! তারপর তুড়ি দিতে দিতে গান ধরলেন—

'হরিনামের গুণে—

গহন বনে—শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।

বল মাধাই মধুর স্বরে—'

ভোম্বল বললে, 'জীবনদা, থাক এত রাত্তিরে আর কেত্তন ধরবেন না, তা'হলে জল- পুলিশের লঞ্চ আবার গান শুনতে ফিরে আসবে।'

জীবনদা বললেন, 'তা'হলে আমিও পাটাতনের ওপর চিৎ-পটাং হয়ে একটু ঘুমিয়ে নেই। সারাদিন সারারাত ধরে আমার ওপর দিয়েও কম ধকল গেল না ! তা ছাড়া পুলিশের জমাদার ব্যাটা বেমক্কা পেটে মেরেছে এক খোঁচা ! ব্যাটা যেন শাহান শা বাদশা !'

এই বলে জীবনদাও চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন। বোধ করি ওরা হু'জনে অনেক-ক্ষণ ঘুমিয়েছে।

সারারাত ধরে নৌকো চলেছে।

তারই কল-কল ছল-ছল শব্দে ঘুমের আমেজটা বেশ ভালো ভাবেই গাঢ় হয়ে এসেছিল।

হঠাৎ ভোম্বলের ঘুমটা ভেঙে গেল। পাটাতনের ওপর উঠে বসলো সে। তারপর অতি আনন্দে চীৎকার করে উঠলো—এ কী জীবনদা, আপনি আমায় একেবারে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ এনে হাজির করেছেন ?

জীবনদাও চোখ কচলে উঠে বসলেন ; উত্তর দিলেন—হুঁ ! এইখানেই ত' নৌকো বাঁধতে হবে আমাদের ! এখন থেকে তুই এই বাবুইবাসা বোর্ডিএ থাকবি।

ভোম্বলের গলায় কৌতূহল আর কৌতুক। শুধোলে—সে কি জীবনদা ? আপনারা আমাকে পোষ্যপুত্তুর করলেন, জমিদার করলেন। সেই জমিদারী কি আমি ভোগ করতে পারবো না ?

জীবনদার গলায় গাম্ভীর্য !

তিনি বললেন, 'শোন ভোম্বল, জমিদারী আর সম্পত্তি তোকে ভোগ করতে হবে না। রায় বাহাদুরের বিরাট বিত্ত আমরা অধিকার করেছি। তুই মাঝে মাঝে গিয়ে ক্ষুদে মালিকের মতো শুধু দেখা দিয়ে আসবি। তা'হলেই সেই সম্পত্তি

বিপ্লবীদের কাজে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে। শিরোমণি ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সব ব্যবস্থা করে নেবো।'

ভোম্বলের চোখে-মুখে তখনও কৌতুক খেলা করে বেড়াচ্ছে। যেন খুব দমে গেছে সে—এই ভাবে অবাক হবার ভান করে বললে—এ্যাঁ! নদী পার হয়ে এখন বুঝি ভেলাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছেন? কোথায় জমিদার হয়ে বসে পায়ের ওপর পা রেখে মাছ, দুধ, ঘী, মাখন, ছানা খেয়ে ভুঁড়ি বাগাবো—তা নয় কিনা, তুই গিয়ে থাক বাবুইবাসা বোর্ডি-এ !!

জীবনদার মুখ কিন্তু গম্ভীর।

তিনি একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন—শোন ভোম্বল, এ হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। তোকে কয়েকটি জরুরী কথা এই ফাঁকে বলে নিই।

উল্কার মতো অনেক ঘুরেছিস্ তুই। এইবার তোকে সত্যিকারের মানুষ হতে হবে।

ভোম্বল জবাব দিলে, 'জীবনদা, তা'হলে কি এতদিন আমি অমানুষ ছিলাম?'

—শোন, তোকে বুঝিয়ে বলি—

জীবনদার ভারী গলা। বললেন, 'এতদিন বিপ্লবীদের প্রয়োজনেই ছুটোছুটি করেছিস্ তুই। হয়ত আমরা মানে বড়রা যে কাজ করতে পারতাম না, সেই অসাধ্য সাধন করেছিস্ তুই। কিন্তু এইবার তোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হচ্ছে সেই পীঠস্থান। এইখানে তুই নিজে পড়াশুনা করে বড় হবি, মানুষ হবি। আর আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করবি। জানিস্ ত' ভোম্বল, ভালো বীজ বপন না করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না। সেই জন্য এখন থেকেই ছোট ছোট ছেলেদের মনে ধীরে ধীরে বারি সিঞ্চন করতে হবে, তারপর বিপ্লবের বীজ বপন করে যেতে হবে। একদিন এরা প্রত্যেকেই সোনার ফসল ফলাবে। আবার প্রয়োজনে অগ্নি-কণার মতো জ্বলেও উঠবে।'

একটুখানি থেমে থেকে জীবনদা আবার বলতে সুরু করলেন—আমি জানি ভোম্বল, এই পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা, বিশেষ করে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ক্ষুদে বিচ্ছুর দল তোকে খুব ভালোবাসে। আর সেই ত' তোর সত্যিকারের সুযোগ। তোর এই ভালোবাসাকে মূলধন করে তুই কাজে লেগে যা। ওদের দেহ আর মন দুই-ই তৈরী করতে হবে। বর্ষার জল যখন জমিতে পড়ে, সেই সময় চাষী ভাই লাঙল চালিয়ে মাটিকে তৈরী নেয় নেয়। জল সিঞ্চনের পালা শেষ হলে তবে চলবে বীজবপন।

তোকেও তেমনি ছেলেদের মনকে তৈরী করে নিতে হবে।

এই বাবুইবাসা বোর্ডিংএ থেকে—ওদেরই একজন হয়ে যা। ওদের জন্য ব্যয়া-

মাগার স্থাপন কর, ভালো করে ছেলেদের শরীরকে শক্ত কর। সাঁতার শিখিয়ে ওদের ক্ষিপ্রগতি করে তোল। হরিণশিশুর মতো দ্রুতবেগে ওরা যেন ছুটতে পারে। তা ছাড়া এখানে আশে-পাশে অনেক নির্জ্জন বনভূমি রয়েছে। সেখানে খুব গোপনে দলবদ্ধ ভাবে ছেলেদের লক্ষ্যভেদ করতে শিক্ষা দিবি। তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ওদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান করবি।

আমি বলছি ভোম্বল, সে কাজ তোকেই করতে হবে। এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হোক তোর কর্মক্ষেত্র, আর হয়ে উঠুক তোর নতুন জীবনের তীর্থক্ষেত্র।

জীবনদার মুখে উদ্দীপনাপূর্ণ কথা শুনে ভোম্বলের শিরায় শিরায় যেন এক নতুন শিহরণ জাগলো।

জীবনদা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভোম্বলকে বললেন, 'দেখ, সনাতনদা দেশমাতার মুক্তির জন্যই তার জীবন উৎসর্গ করে চলে গেছেন। তাই তার কাজ আমাদেরই করতে হবে।

সনাতনদা মারা গেছেন শুনে ভোম্বল হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। জীবনদা ভোম্বলের মাথায় হাত রেখে বললে কাঁদিসনে ভোম্বল, কাঁদিসনে। সনাতনবাবু যে কাজ করতেন তার ভার আমাকে আর তোকেই নিতে হবে। তাহলেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে। কি তুই পারবিনে?

পারবে, জীবনদা।

ভোম্বল নত হয়ে জীবনদার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, সনাতন আর 'আপনার কল্পনাকে আমি রূপ দেবো জীবনদা! আজ থেকে এই কাজই হোক আমার জীবনের ব্রত!'

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলের দল হঠাৎ সকালবেলা জীবনদার সঙ্গে ভোম্বলকে নৌকো থেকে নামতে দেখে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। ছেলেরা ঘিরে ধরলো ভোম্বলকে।

—এ কী ভোম্বল তুমি!

—হ্যাঁ, আমিই ত'। তোরা ভূত দেখছিস্ নাকি?

—এখন থেকে আমাদের সঙ্গে আমাদের বোর্ডিংএ থাকবে?

—থাকবো বলেই ত' এলাম।

—কী মজা! কী মজা!! কী মজা!!!

ছেলেদের আনন্দ-উল্লাসে যেন জোয়ার জাগলো।

ভোম্বল কোন্ ঘরে থাকবে—তাই ঠিক করতে বোর্ডিং-এর ছেলেরা মেতে উঠলো। ছেলেদের একজন বললে, 'আমরা ঘরটা চুনকাম করে দেবো।'

আর একজন বললে, 'আমরা, ঘরটাকে নানা রকম ছবি দিয়ে সাজিয়ে ফেলবো।

—শুধু জাতীয় নেতাদের ছবি থাকবে।

—মাঝখানে ভারতমাতার একটি সুন্দর পট!

—রোজ সকালবেলা আমরা বন্দে মাতরম্ গান গাইবো।

—প্রত্যহ দাঁড় টেনে নৌকো বাইবো।

ছেলেদের মধ্যে যখন নানা আলোচনা চলছিল, জীবনদা তখন ভোম্বলকে নিয়ে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

একটা জায়গা জীবনদার ভারী পছন্দ হল। চারদিকে বড় বড় গাছ, আর মাঝখানে একেবারে ফাঁকা অঞ্চল—যেন ওদের প্রয়োজনেই কে তৈরী করে রেখেছে।

জায়গাটা ভালোরূপে দেখে নিয়ে জীবনদা বললেন, 'লক্ষ্যভেদ শেখবার এই উপযুক্ত জায়গা।

জীবনদা ব্যায়ামাগারেয় জায়গাও ঠিক করে ফেললেন। মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ছেলেরা কুস্তি লড়বে।

দিন কয়েক বাদেই বোর্ডিং-এ বাণী-বন্দনা উৎসব।

জীবনদার আগ্রহে আর ছেলেদের উৎসাহে এবার খুব ভালো ভাবে পূজো হচ্ছে।

সর্বশুক্লা সরস্বতীর মূর্তিখানি কী সুন্দর। ছেলেরা দল বেঁধে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিচ্ছে।

দেবীমূর্তির পিছনের চালচিত্রিতে একদিকে ভারতমাতার ভুবন-ভোলানো চিত্র শোভা পাচ্ছে। অন্য পাশে রয়েছে ভারতবর্ষের মানচিত্র।

দেবীকে প্রণাম করে—ভোম্বল মনে মনে কামনা করলো—আমার মনস্কামনা যেন সিদ্ধ হয়; এই অগ্নিকণার দল যেন ভারতের স্বাধীনতাকে একদিন বরণ করে নিয়ে আসতে পারে।

বন্দে মাতরম্!